দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বাঙ্গালি হিন্দুর
হোমল্যান্ডের চাবি
নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল
পৃঃ —২৩

রাজ্য সরকারের স্বার্থপ্রণোদিত
নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে রাজ্যপাল
সক্রিয় হতে পারেন
পৃঃ —১১

৭২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ১৮ নভেম্বর ২০১৯।। ১ অগ্রহায়ণ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

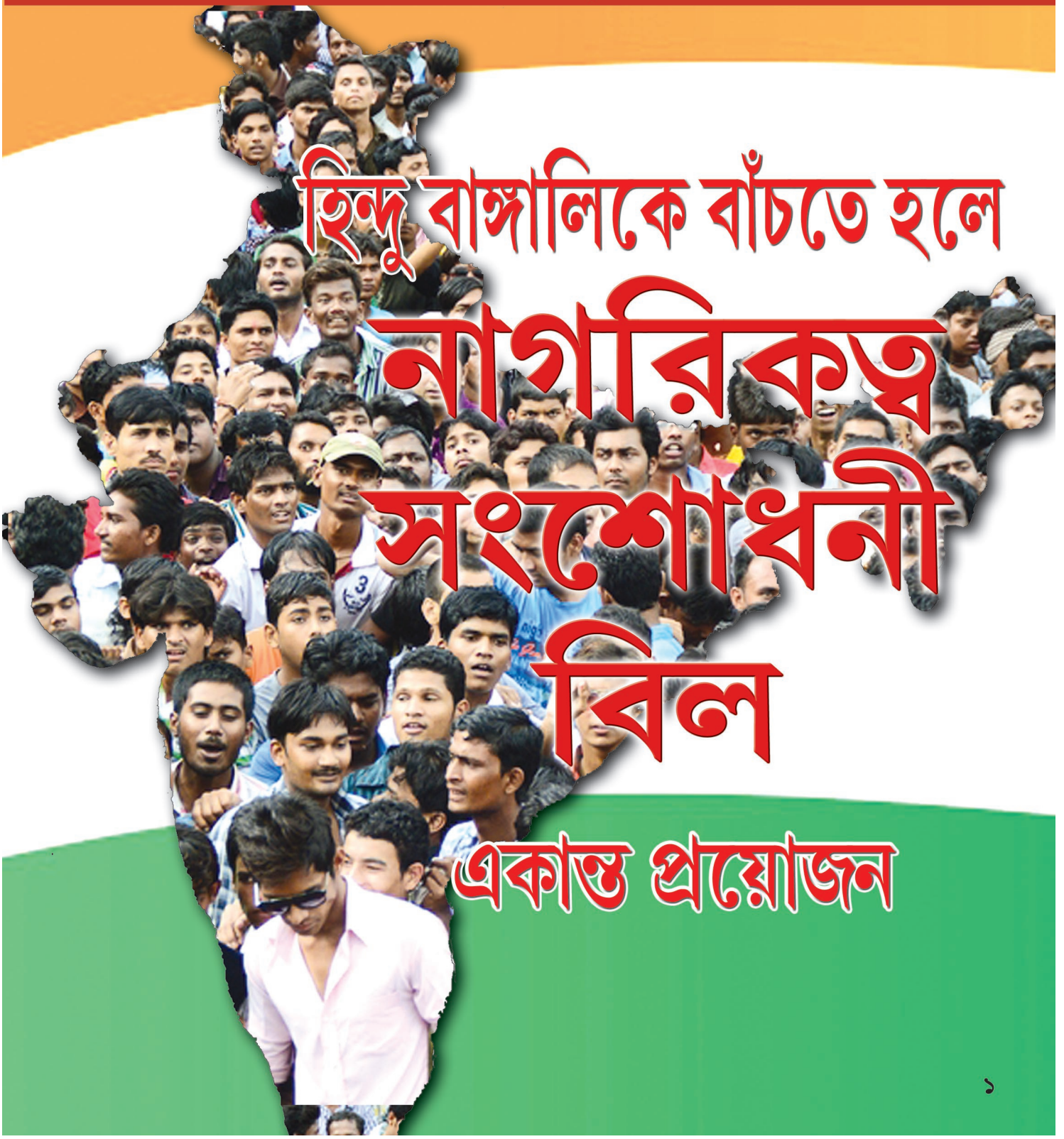

হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচতে হলে

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল

একান্ত প্রয়োজন

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৮ নভেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

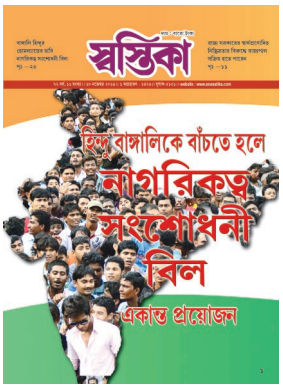

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

রামমন্দির রায় : দিনভর উস্কানি দিয়ে গেল নানা কিসিমের বামপন্থীরা □ বিশ্বামিত্র □ ৬

খোলা চিঠি : রামমন্দির কেন হবে ? □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

শোরগোল নিরর্থক, সর্বার্থে খুঁতহীন রায়দান বাস্তবে সোনার হরিণ □ অর্ঘ্য সেনগুপ্ত □ ৮

রাজ্য সরকারের স্বার্থপ্রণোদিত নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সক্রিয় হতে পারেন □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১১

মুক্ত বাণিজ্যে মুক্তি নাস্তি □ শেখর সেনগুপ্ত □ ১৩

এশিয়ার মুক্ত বাণিজ্য থেকে সাময়িক আত্মরক্ষা □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৪

আরসিইপি বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি জাতীয় অর্থনীতির নিঃশব্দ ঘাতক □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৬

নতুন প্রজন্ম মুখ ফেরাচ্ছে বহুরূপী শিল্প থেকে □ তিলক সেনগুপ্ত □ ১৮

বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ডের চাবি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল □ সাধন কুমার পাল □ ২৩

হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচতে হলে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন একান্ত প্রয়োজন □ মোহিত রায় □ ২৮

ধরিত্রীর দেবতা বিরসা মুণ্ডা □ তারু মুণ্ডা □ ৩১

শীতকালীন অধিবেশনে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল পাশ হওয়া জরুরি □ উর্মীশ্রী দেব □ ৩৫

খুনি ইয়াসিন মালিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ৩৭

বাঙ্গালি চৌত্রিশ বছর আলিমুদ্দিনে বন্দি ছিল, এখন তৃণমূলের দুর্নীতির পাঁকে হাঁসফাঁস করছে □ বলাইচন্দ্র চক্রবর্তী □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০** □ **খেলা : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা : ৪২** □ **শোক সংবাদ : ৪৯** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ২৫ নভেম্বর ২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৫ নভেম্বর ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

যথা ধর্ম তথা জয়

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতি সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়েছেন যে, অযোধ্যার বহু চর্চিত জমিতে রামমন্দির নির্মাণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এই রায়ে জয়ী হয়েছে ধর্ম। এই ধর্মের ভিত্তি হলো সত্য। এই ধর্ম এদেশের মানুষের জীবনদর্শন। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম এই ধর্মের আধারস্বরূপ। মহামান্য আদালত অযোধ্যায় শ্রীরামের অবিসংবাদী প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় অযোধ্যা মামলায় আদালতের রায়। লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, বিজয় আঢ্য, সুজিত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ, সুদীপ নারায়ণ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই রায়ে জয় হইয়াছে ভারতবর্ষের

দীর্ঘ একশত চৌত্রিশ বৎসরের প্রতীক্ষার শেষে ভারতীয়দের অস্মিতার প্রতীক অবশেষে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে অযোধ্যার বহু চর্চিত ওই ভূমিতে রামলালার মন্দিরই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করিয়াছে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষক সংস্থার খনন কার্যে ইতিপূর্বেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে বাবরি ধাঁচার বহু আগেই ওই স্থলে হিন্দু স্থাপত্য বিরাজমান ছিল। যে দাবি দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ করিয়া আসিতেছে, সেই দাবিই উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়ে মান্যতা পাইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে রামমন্দির সংক্রান্ত মামলাটি সম্ভবত সর্বাধিক দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিয়া আসা মামলাগুলির মধ্যে অন্যতম। দেশের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং এই মামলার ডিভিশন বেঞ্চের অন্য চার মাননীয় বিচারপতিকে এই কারণেই ধন্যবাদ জানাইতে হয় যে, তাঁহারা বিষয়টিকে অমীমাংসিত রাখেন নাই। বরং, ইহার একটি নিষ্পত্তি করিয়াছেন। রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার একটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তি হউক, ইহা ভারতবাসীর বহুদিনেরই ইচ্ছা ছিল। সুপ্রিম কোর্ট সেই ইচ্ছাকেই মান্যতা দিয়াছে। যে কারণেই, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর দেশে বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, রামমন্দির সংক্রান্ত রায় প্রকাশ হইলে পর দেশের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বারংবার আবেদন জানানো হইয়াছিল যে, রায় যাহাই হউক না কেন, তাহা শান্ত চিত্তে গ্রহণ করিয়া সকলেই যেন সংযত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই আবেদন করিয়াছিলেন। সঙ্ঘ এবং প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদনকে দেশবাসী মান্যতা দিয়াছেন। রায় প্রকাশিত হইবার পর কোথাও কেহই কোনোরকম অসংযত আচরণ করে নাই। বরং সকলেই শান্তি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কংগ্রেস-সহ প্রায় সব বিরোধী দলই এই রায়কে স্বাগত জানাইয়াছে। এই ঘটনাগুলিই প্রমাণ করিতেছে, রামমন্দির সংক্রান্ত রায়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খুশি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই ঠিক এইরকমই একটি রায়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমও আছে। এই ব্যতিক্রমীদের ভিতর পড়ে বামপন্থী এবং সেকুলার বুদ্ধিজীবীগণ এবং তাহাদের সমমনস্ক সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টিকে তাহারা কোনোভাবে মানিতে পারিতেছে না। রায়দানের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টকে লক্ষ্য করিয়া নানারকম কটূক্তি এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বন্যা বহাইয়া দিতেছে ইহারা। ইহারা নিজেরাই প্রমাণ করিতেছে, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা নাই। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় ইহারা বিশ্বাস করে না। সংবাদ মাধ্যমের একাংশের ভূমিকা তো আরও ঘৃণ্য। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর সমাজের সকল অংশের মানুষ যখন সংযম প্রদর্শন করিতেছে, তখন এই সংবাদমাধ্যমগুলি নানারকম উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলিয়া একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সংবাদমাধ্যমের এহেন উস্কানিতে কেহই কর্ণপাত করে নাই। বামপন্থী-সেকুলার বুদ্ধিজীবীগণ এবং তাহাদের সমমনস্ক এই সংবাদমাধ্যমগুলি সুপ্রিম কোর্টের এই রায় পছন্দ করিবে না—ইহাই স্বাভাবিক। কারণ ইহারা চিরকাল ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় পরম্পরার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় তাহাদের এতদিনকার সেইসব বিরোধিতাকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় মোহন ভাগবত বলিয়াছেন, এই রায়ে কাহারো জয় হয় নাই, কাহারো পরাজয় হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে, শ্রীরামচন্দ্র শুধুমাত্র হিন্দুর নহেন। তিনি সমগ্র ভারতবাসীর। ভারতবাসীর অস্মিতা, ভারতের ন্যায়, ধর্ম, দর্শন— সবকিছুরই প্রতীক তিনি। তিনি সকল ভারতবাসীর রাষ্ট্রপুরুষ। এই রায়ে জয় হইয়াছে সেই ভারতবর্ষেরই।

সুভাষিতম্

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

যেনাক্রমন্ত্য ঋষয়ো হ্যাপ্তকামো যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।। (মুণ্ডকোপনিষদ)

সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের নয়। এটি সেই পথ যা অতিক্রম করে আপ্তকাম ঋষিগণ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত করে থাকেন।

রামমন্দির রায় : দিনভর উস্কানি দিয়ে গেল নানা কিসিমের বামপন্থীরা

বিশ্বামিত্র-র কলম

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে। সবাই জানতো ১৭ নভেম্বরের মধ্যে অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষিত হবে। বাতিল করা হয় সঙ্ঘের যাবতীয় বৈঠক। অধিকারী ও প্রচারকদের বলা হয় নিজ নিজ স্থানে থাকতে। এর উদ্দেশ্য ছিল একটাই, জনগণকে শান্ত রাখা। সে রায় যেমনই আসুক না কেন। অযোধ্যা মামলা ঘিরে হিন্দু সমাজের ধৈর্যের বাঁধ ক্রমশ ভাঙছিল, তাদের সংযত রাখা; মামলার রায় বিপক্ষে পেলেও পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি, মানুষকে বোঝানো, আবার রায় পক্ষে গেলে শান্তি বজায় রাখা, উচ্ছ্বাসে সংযম রাখা— আর এস এস এবং তাদের শাখা সংগঠনগুলি সম্প্রীতি রক্ষায় অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছে। রামজন্মভূমি মামলার এই রায়ই প্রত্যাশা করেছে গোটা দেশ। মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত হওয়ার পরও সংযমী প্রতিক্রিয়া, উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভাঙলেও প্রকাশ্যে, বাহ্যিকভাবে তার প্রকাশ ছিল না। বিজেপি-আরএসএসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেশভক্তির কথা বলেছেন, দেশবাসী অকুণ্ঠ সাধুবাদ দিয়েছেন তাঁদের। কংগ্রেস সহ প্রায় সব বিরোধী দল মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়েছে, সে যার যেমনই রাজনীতিবোধ থাকুক না কেন। এমনকী জামা মসজিদের ইমাম-সহ মুসলমান সম্প্রদায়ের সিংহভাগও রায়কে মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই ঐক্যবদ্ধ ভারতের ছবির পাশাপাশি সেদিন পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যক্ষ করল দেশের আরেক চিত্র। হাতে গোনা মৌলবাদী মুসলমানদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে যারা শুধু রামমন্দির নির্মাণের বিরোধিতাই করল না, চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ওপর নগ্ন আক্রমণ চালালো, পাকিস্তানকে যারপরনাই খুশি করে। ভারতীয় রাজনীতির এই একমাত্র ব্যতিক্রমী দলটা সবার পরিচিত, চৌত্রিশ বছরের দুঃশাসনে পশ্চিমবঙ্গের স্রেফ সর্বনাশই করেনি, উর্বর এক ভূমিকে শ্মশানে পরিণত করেছিল আর মুসলমান মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে মিনি পাকিস্তানে রূপান্তরিত করেছিল, যার খেসারত আজও দিতে হচ্ছে।

ভারতবর্ষের গণতন্ত্র-সংবিধানকে পদদলিত করে ১৯৬৪ সালে ভারত আক্রমণকারী চীনের দালালি করবার কারণে যে দলের জন্ম, যাদের পূর্বপুরুষ জেহাদি সংসর্গে জন্ম নিয়েছিল তারা উগ্র ভারত-বিরোধী হবেই। তার প্রদর্শন দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পলিটব্যুরোর বিবৃতিতে। এদের একাংশ রায় ঘোষণার আগে শান্তির বাণীর মুখোশ পরলেও, নকশাল পরিচালিত জঈশ-ই-মহম্মদে প্রতি আস্থাশীল বাঙ্গলার সবচেয়ে 'বিকৃত' দৈনিকপত্র-এর পক্ষ থেকে লাগাতার উস্কানি দেওয়া হচ্ছিল। কল্পিত মুসলমানদের নাম দিয়ে তারা রায়ের আগে কতটা বিপন্ন তার প্রচার হচ্ছিল। রায় বেরোতে এদের সম্পাদকীয় সদস্য ও তাদের তাঁবেদারদের আর পায় কে। এমনিতেই সুযোগ পেলে দেশের সংবিধানকে পদদলিত করার অভ্যাস এদের মজ্জাগত। এবং বাবরি ধাঁচার শোকে এদের বুক ধড়পড়ানি গত সাতাশ বছরের অভ্যাস। তার পরিসমাপ্তিতে এদের ব্যথায় এমনই চাগাড় দিয়েছিল যে নির্বিচারে গত ৯ নভেম্বর রায় ঘোষণার পর সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে চলল উস্কানি আর দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর অনাস্থা।

সাধারণ বামেরা অবশ্য আরেক কাঠি ওপরে। কারুর মন্তব্য এবার তাজমহল ভেঙে দেওয়া হবে, কেউ বলছে মুসলমানদের দেশছাড়া করা হবে, আবার প্রধান বিচারপতিকে কটাক্ষ করে বলা হচ্ছে ভারত-রত্ন পাওয়ার লোভে তিনি এমন করেছেন, অনেকে ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হলো— জওহরলাল নেহরু-জ্যোতি বসুর ভারত কোথায় গেল তা ভেবে সারা হচ্ছে। ৯ নভেম্বর, ২০১৯ সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা কিসিমের বামপন্থীরা সদা সচেষ্ট এমন গুজব মাঝেমধ্যে আকাশে ওড়ে বটে, তবে সেদিন মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলে দাঙ্গা বাঁধানোর এমন পরিকল্পিত প্রয়াস বামপন্থীরা আর অতিবাম পরিচালিত যে দৈনিকটি নিয়েছিল তা এর আগে আর কখনও দেখা গিয়েছে বলে মনে পড়ে না।

দাঙ্গার সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের জুড়ে দেওয়ার যে প্রবণতা এরা সৃষ্টি করেছে, তার কারণটাও বোধহয় এদিন বোঝা গেল। কারণ নিজেদের আড়াল করার এমন প্রকৃষ্ট উপায় সত্যিই বিরল। হিন্দু সমাজ সেদিন শান্ত, সংযত থেকে ভারতবর্ষের শাশ্বত ভাবধারার জয় উপলব্ধি করেছে। আর দেশের শান্তিভঙ্গকারী, দাঙ্গাবাজ পাকপক্ষ তাদের পিতৃভূমি পাকিস্তানকে খুশি করার লক্ষ্যে ১৯৯২-এর ডেমো প্রদর্শনের যাবতীয় চেষ্টা করেছিল। প্রশাসন সতর্ক না হলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। আগামীদিনেও এরা দেশের শান্তি বিঘ্নের চেষ্টা করবে বাকস্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের আড়ালে তাই প্রশাসনের সঙ্গে জনগণকেও সতর্ক থাকতে হবে। শুধু নির্বাচনে কুলোর হাওয়া দিয়ে এদের বিদায়ই যথেষ্ট নয়, সামাজিক প্রতিরোধেরও প্রয়োজন। ▌

রামমন্দির কেন হবে?

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

গোটা দেশ আনন্দে আছে। প্রধানমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন অযোধ্যা ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের রায় কারও জয় বা পরাজয় নয়। গোটা দেশ সেটা মেনে নিয়েছে। কারও যেমন জয়ের উল্লাস নেই, তেমনই নেই পরাজয়ের আক্ষেপ। রাম ভক্তি, রহিম ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতভক্তির নজির রেখেছে দেশ। কিন্তু এটা তো কাঙ্ক্ষিত ছিল না। আমাদের ভাবনা ছিল, খুব গোলমাল হবে। যেমন কংগ্রেস রাজত্বে হতো। এই দেশ কত ছোটোখাট ঘটনায় বড়ো বড়ো দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখেছে। কিন্তু সেসব যে কিছুই নেই দেশে। আর তাতেই চোখের জল ধরে রাখতে পারছেন না একদল মানুষ। আবার চোখের জল ফেলতেও পারছেন না। সেই সব রুদালিদের বড়ো দুঃখের দিন।

ফেসবুক থেকে চায়ের দোকান, সর্বত্র তাদের দেখা যাচ্ছে শুকনো রুমাল নিয়ে ঘুরতে। কত কী ভেবে রেখেছিলেন তাঁরা। ভেবেছিলেন দেশজুড়ে খুব লোগমাল হবে আর চোখের জল ফেলে বেড়াবেন। সরকারকে দুষবেন, সুপ্রিম কোর্টকে দুষবেন। সব দায় হিন্দুত্ববাদীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার খেল খেলবেন। কিন্তু না, গোটা দেশ দেখিয়ে দিল রাম-রহিমের পাশাপাশি ভারতভক্তিও তৈরি হয়ে গেছে। আর সেই কাজটা করে দেখিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদী।

এই কি প্রথম নাকি! জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের দিনেও কত সে আশঙ্কা! পাকিস্তান ও পাকিস্তানপন্থী ভারতীয়দের সে কী লম্ফঝম্প! ভাবটা এমন যেন, এ কী করিলে! কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী— কিছুই হয়নি। একটি বুলেটও খরচ করতে

হয়নি সেনা থেকে পুলিশ কাউকে। গোটা দেশে তো নয়ই, খোদ উপত্যকাতেও নয়। মন খারাপ হবে না বলুন। এত বড়ো একটি সিদ্ধান্ত মুহূর্তে নিয়ে নেওয়াই শুধু নয়, সেই সঙ্গে গোটা বিষয়টা শান্তিপূর্ণ পথে সমাধা করে দেওয়া কেন হবে! এটা কি হতে পারে! পশ্চিমবঙ্গে একটা উপনির্বাচন করতেও যেখানে প্রাণের বলি দিতে হয় কাউকে না কাউকে সেখানে এত বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে আর তাতে কোনও গোলমাল হবে না, সেটা কেমন করে মেনে নেওয়া যায়!

একটার পর একটা। দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসা নরেন্দ্র মোদী সরকার যেন ম্যাজিকের পরে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। প্রথমেই তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইন পাশ। এর পরে পরেই দেশকে চমকে দিয়ে এক সকালে ঘোষণা— কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা আর রইল না। এবার অযোধ্যা। অনেকেই বলবেন যে, ১৩৪ বছরের অযোধ্যা মামলার মীমাংসায় কেন্দ্রের হাত নেই, সবটাই করেছে সুপ্রিম কোর্ট। একদম ঠিক কথা। কিন্তু তার পরে দেশকে এমন শান্ত রাখার কৃতিত্ব মোদী সরকারকে দিতেই হবে। সেই সঙ্গে আধুনিক ভারতকে।

এবার মন্দির হবে। মসজিদও হবে। নতুন করে সেজে উঠবে অযোধ্যা নগরী। কষ্ট হবে। খুব কষ্ট হবে। ১৩৪ বছরের মামলাটা মিটে গেল বলে খুব কষ্ট হবে একদল মানুষের। পাঠকগণ, তাদের জন্য আপনারাও একটু চোখের জল ফেলুন। ভাবুন সেই সব দাদা, দিদিদের কথা। যারা কতদিন ধরে এমন একটা দিনের কথা ভেবে এসেছিল। ভেবেছিল কেন্দ্রের মোদী সরকারকে গাল দেওয়ার পরম লগনটি এসে যাবে। অনেক রক্ত দেখা যাবে। সেই রক্ত দেখে হা-হুতাশ করা যাবে। কিন্তু কোথায় কী!

—সুন্দর মৌলিক

শোরগোল নিরর্থক, সর্বার্থে খুঁতহীন রায়দান বাস্তবে সোনার হরিণ

অতিথি কলম

অর্ঘ্য সেনগুপ্ত

শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ভারতে পুরোদমে জারি রয়েছে। অযোধ্যার রায় তারই একটি মাইলস্টোন। ইহলৌকিক জগতে বিচরণ করে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে কীভাবে বিচার করতে হবে বাস্তব জীবনে তার চর্চা কতদুর প্রসারিত করা যাবে এ নিয়ে রামায়ণে বিস্তর টানাপোড়েনের ঘটনা রয়েছে। রামায়ণ মোটেই কোনো অদৃশ্যমান জগতের দেবতাদের কাহিনি নয়। প্রাসাদ বাসিন্দা হিসেবে তার সংশ্লিষ্ট রাজনীতিতে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানব-মানবী কীভাবে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনচর্যাকে ক্রমাগত শ্রেষ্ঠতার দিকে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এটি তারই উপাখ্যান। যেখানে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন বড়ো ভূমিকা নেয়। রামচন্দ্রের জীবন আমাদের দেখায় রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ ও রাষ্ট্র নিজে কিভাবে পারস্পরিক কল্যাণে কাজ করে যেতে পারে। একই সঙ্গে তাঁর জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা শুধুমাত্র আচারনিষ্ঠ পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। জীবনে কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমেই তার অর্জন আর তাতে কিছু ত্রুটিও থেকে যেতে পারে।

সাম্প্রতিক অযোধ্যার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় আদতে রামায়ণেরই একটি ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ। রামের জন্মস্থান নিয়ে হিন্দু মানসে চিরস্থায়ী অধ্যাত্ম চেতনা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তবের একটি মসজিদের ওই স্থানে অবস্থান নিয়ে শতাব্দী প্রাচীন বিতর্কের সঠিক নিরসনের প্রচেষ্টাই এই রায়ের সারাৎসার।

রামায়ণের মতোই এই বিচারপর্বেও ছিল আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে ইহলোকিক অবস্থানের এক পারস্পরিক সংঘর্ষময় পরিস্থিতি। এই পরস্পরবিরোধী অনেক সময় অনির্ণেয় শক্তির দ্বন্দ্বের সমাধানে সর্বোচ্চ আদালত অধিকাংশ বিতর্কিত বিন্দুতেই সঠিক মীমাংসা সংবলিত রায়ই দিয়েছেন। দিয়েছেন এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশ।

> “এই রায় নিয়ে সব সময় দু'টি মত থাকবে। এটি বাস্তবভিত্তিক ও প্রজ্ঞাপ্রসূত কিন্তু দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের দিকে যেন একটু ঝুঁকে আছে। একটি প্রথম পক্ষের, একটি বিরোধী পক্ষের। ঠিক যেমন রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাম সীতাকে পরীক্ষা দিতে বলছেন কেননা তাঁকে রাবণ হরণ করেছিলেন। এই মিথটির মতো এই রায়ের মধ্যেও হয়তো কোনো অংশ জটিল ও একপক্ষীয় প্রতীয়মান হতে পারে।”

চূড়ান্ত রায়দান পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার তোড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে অত্যন্ত জটিল কিছু আইনি প্রশ্নে আদালতের যুক্তি ও বিশ্লেষণ। এর মধ্যে কঠিনতম ছিল শ্রীরামের জন্মস্থানের আইনি বৈধতা।

১৯৫০ সালে সুপণ্ডিত প্রধান বিচারপতি বি. কে. মুখার্জি হিন্দু আইনের ওপর এমনই একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য রায় দান করেছিলেন।

খুব ভালভাবে খেয়াল করুন। সর্বোচ্চ আদালত রামজন্মের নির্দিষ্ট স্থানটির কোনো আইনি বৈধতা নেই বলে হিন্দু পক্ষের দাবি খারিজ করে দেন। কিন্তু বিচারক অন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তি অবলম্বন করে বললেন স্থানের পরিবর্তে পুজ্য দেবতার আইনি বৈধতা নিশ্চয় আছে কেননা এই হিন্দু দেবতার পূজা-অর্চনা যাতে বাধাহীনভাবে হয় তারই পবিত্র ভাবনা নিয়ে এই দেবতার উদ্দেশ্যেই জমি অর্পিত হয়েছে। নির্দিষ্ট জমিতে দেবতার তাই পূর্ণ অধিকার আছে। শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর রায়দানকে এড়িয়ে দেবতার ওপর মানবিক অস্তিত্ব আরোপের এ এক অসাধারণ আইনি ব্যাখ্যা। শুধুমাত্র ব্যক্তির বিশ্বাসের যুক্তিটিকে ভিত্তি করলে ভবিষ্যতে অনেক মানুষই নিজস্ব আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সেই স্থানটির বাস্তব মালিকানা দাবি করতে পারে যার আদৌ কোনো আইনি বৈধতা নেই। এর পরিণতিতে দেশে সহজেই আইনের শাসন হটে গিয়ে বিশ্বাসীদের শাসন জারি হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা তৈরি হবে। ১৯৫০ সালের অত ধৈর্য ও প্রতীক্ষার দামে তৈরি সংবিধানের মর্যাদাই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

অনেকে বলছেন আদালত প্রমাণকে সরিয়ে রেখে বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে রায় দিয়েছেন। এমন লোকেরা রায়ের বিরাট অংশকে এড়িয়ে যাচ্ছেন শুধু নয়, তাঁরা প্রমাণ কথাটির তাৎপর্য বুঝতে পারছেন না। শতাব্দী প্রাচীন কোনো বিবাদিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কতকগুলো title deed বা সম্পত্তি সম্পর্কিত কাগজপত্রই কোনো প্রমাণ হতে পারে না। বিতর্কিত সম্পত্তিটির ব্যবহার কীভাবে হয়েছে সেই বিষয়ের মূল্যায়নের ভিত্তিকেই প্রমাণ হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে।

এই সূত্রে আদালত এটাই বিচার করেছে যে হিন্দুরাই তুলনামূলকভাবে অতি দীর্ঘদিন অবিচ্ছিন্নভাবে বিতর্কিত জমিটির বহির্ভাগে তাদের দেবোপাসনা চালিয়ে গেছে। ভেতরের অংশে যেখানে একটি মসজিদও ছিল সেখানেও অন্তত ১৮৫৭ সাল অবধি হিন্দুরা পূজা অর্চনা করেছে। এই যুক্তির অনুসরণে আদালত হিন্দু-মুসলমান উভয় তরফের দেওয়া যুক্তির ভিত্তিকে গ্রহণ করে উভয়েরই কিছু সম্পত্তি জনিত অধিকারকে মেনে নিয়েছে। কেউ একমত নাও হতে পারেন যে কীভাবে হিন্দুদের আংশিক প্রমাণ আদালত পূর্ণ প্রমাণ হিসেবে ধরল। কিন্তু পূর্ণ প্রমাণের প্রশ্নে আদালতকে মোটেই দোষ দেওয়া যায় না। উল্টো দিকে আদালতকে কিছুটা বৈষম্যের জন্য দায়ী করার প্রশ্নে অনেক বড়ো অন্য বিষয় রয়েছে। বিতর্কিত সমস্ত কাঠামো ও জমি তো হিন্দুদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুটা ভরপাই করতেই ধরে নেওয়া যায় মুসলমানদের বিতর্কিত ২.৭৭ একরের বদলে প্রায় ডবল ৫ একর জমি প্রদান করা হয়েছে যেখানে তারা মসজিদ বানাতে পারবে।

এখানে দুটো প্রশ্ন আসবে, আদালতের কি এই ধরনের অদল বদল করে কোনো পক্ষকে কিছুটা স্বস্তিদায়ক অবস্থানে রাখার কারণে জমি দেওয়ার অধিকার আছে? যদি অদলবদল (অন্য জায়গায় ৫ একর বিতর্কিত অঞ্চলে নয়) করাই হয় তা কি ভবিষ্যতে আইনগ্রাহ্য হবে? সংবিধানের ১৪২ নং ধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ আদালতের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত কোনো রায় নেওয়ার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্ণ অধিকার আছে। অতীতে অবশ্য পালিত সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে রূপরেখা তৈরি, MBBS-এ ভর্তির পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ বা বিচ্ছেদ মামলার ক্ষেত্রে আদালতকে কিছু ইচ্ছামতো আইনি ক্ষমতা একই সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। এই মামলার ক্ষেত্রে তা নয়। নির্দিষ্ট করে এমন জটিল একটি সংবেদনশীল মামলার ক্ষেত্রে আদালত যাতে সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছাতে পারার কারণে তার ওপর ১৪২ ধারা বলে সম্পত্তি বণ্টনের পূর্ণ ক্রমে করা হয়েছিল।

আদালত যে প্রক্রিয়ায় এই ধারাটি ঘোষণা করেছে এবং ১৪২ নং ধারায় তার ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করেছে তাতে মুসলমানদের অনেকের মোহভঙ্গ হয়েছে। তারা আধুনিক ভারতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে চিন্তাশীল হয়ে পড়ছে। এই মোহভঙ্গ যাতে জাতির প্রতি উদাসীনতার দিকে না গড়ায় তেমন পরিস্থিতি হওয়ার আগে একটা বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। বিতর্কিত জমিটি এখনও গঠিত হয়নি এমন একটি ট্রাস্টের হাতে দেওয়া হবে। এর অর্থ এমনটা ভালো ভালো যে প্রস্তাবিত ট্রাস্ট সদস্যরা কিছুটা রাষ্ট্রপুরুষের গুণান্বিত হবেন এবং তার ফলে মসজিদ তৈরির জমিটি প্রস্তাবিত রাম মন্দিরের থেকে খুব দূরে যাতে না হয় যেটা নিশ্চিত করবেন। ভবিষ্যতে জাতির নির্মাণে কতটা যত্ন ও পারস্পরিক সম্মান নিয়ে মসজিদ তৈরিতে সহযোগিতা করা হচ্ছে তার একটি নির্ণায়ক ভূমিকা থাকবে।

আদালত ১৯৪৯ ও ১৯৯২ সালে মসজিদের বিকৃতি ও ধ্বংসের মতো আইনভঙ্গকে চিহ্নিত করেছে। একই সঙ্গে তার আইনসম্মত বিধি বিধান যে কাম্য তাও জানাতে ভোলেনি।

এই বিষয়টি ছাড়াও এই রায় নিয়ে সব সময় দু'টি মত থাকবে। এটি বাস্তবভিত্তিক ও প্রজ্ঞাপ্রসূত কিন্তু দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের দিকে যেন একটু ঝুঁকে আছে। একটি প্রথম পক্ষের, একটি বিরোধী পক্ষের। ঠিক যেমন রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাম সীতাকে পরীক্ষা দিতে বলছেন, কেননা তাঁকে রাবণ হরণ করেছিলেন। এই মিথটির মতো এই রায়ের মধ্যেও হয়তো কোনো অংশ জটিল ও একপক্ষীয় প্রতীয়মান হতে পারে। আগেই তো বলা হয়েছে সার্বিক ন্যায় প্রদানের প্রক্রিয়া সৎভাবে এগিয়ে চলেছে।

(লেখক কেন্দ্রীয় আইন প্রণালী কেন্দ্রের গবেষণা পরিচালক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রম্যরচনা

ছাত্র-শিক্ষক সংলাপ

শিক্ষক ক্লাসে পড়াতে এসে বললেন, 'এক যুবক বাসন ধুয়েছিল এবং এক যুবককে বাসন ধুতে হয়েছিল— এই দুটি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কী? ছাত্রদের মধ্যে একজন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল, 'প্রথম যুবকটি অবিবাহিত আর দ্বিতীয়জন বিবাহিত স্যার।'

আমও গেল ছালাও গেল

মহারাষ্ট্রে শিবসেনার সরকার গড়ার দাবি এবং তাদের সমর্থন করা নিয়ে কংগ্রেস ও এনসিপির গড়িমসি প্রসঙ্গে ঘেন্টুর উপলব্ধি : আমার বাবার মুখে গল্পটা শুনেছিলাম। একটা লোক মন্দিরের খাবার ঘরের দরজার কাছে জুতো খুলে ভেতরে গিয়ে শুনল খাবার শেষ হয়ে গেছে। আজ আর খাবার পাওয়া যাবে না। খিদেয় কাহিল লোকটা বাইরে এসে দেখল জুতোজোড়াও হাওয়া। গল্প শুনে হতবাক সেন্টুকে বলল ঘেন্টু, শিবসেনার অবস্থা এখন ওই লোকটার মতো সরকার গড়ার স্বপ্ন এখন বিশ বাঁও জলে। এদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে ভোটব্যাঙ্কেও তার ছাপ পড়বে। অর্থাৎ আমও গেল, ছালাও গেল। চোষ এখন আমড়া...

সিঙ্গুরে রাজ্যপাল ধনখড়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সেরে শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে রাজ্যপাল জগদীশ ধনখড় উপস্থিত হয়েছিলেন সিঙ্গুরের বিডিও অফিসে। রাজ্যপাল বিডিও অফিসে এলেও বিডিও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জয়েন্ট বিডিও স্বপন ঘোষ অফিসে ছিলেন না। জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল আসছেন খবর পেয়েই তারা বিডিও অফিস ছেড়ে চলে যান। বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিও-র এই ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যেই কথা উঠেছে। তবে এই দুই সরকারি আধিকারিক অনুপস্থিত থাকলেও স্থানীয় মানুষরা বিডিও অফিসে এসে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। স্থানীয় মানুষরা তাদের নানারকম অভাব-অভিযোগের কথা জানান রাজ্যপালকে। রাজ্যপালের কাছে তারা অভিযোগ জানান, সিঙ্গুরে চাষ বন্ধ, অথচ শিল্পও হলো না। স্থানীয় প্রশাসন কোনো কাজ করছে না— এই অভিযোগও তারা রাজ্যপালকে জানান।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যপাল বলেন, 'সিঙ্গুরের বিষয়টা আমি ওপর থেকে দেখেছি। মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখিনি। সিঙ্গুর নিয়ে আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে। আমি প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সিঙ্গুরের সমস্যা বুঝব। তারপর যা করার করব।'

উবাচ

"পুরাতত্ত্ব রিপোর্টে মন্দিরই সাব্যস্ত। আমি আজ সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। মুসলমানদের কাছে মক্কা-মন্দিনা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, হিন্দুদের কাছে অযোধ্যাও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটি মেনে নিতে আমাদের কী আপত্তি থাকতে পারে?"

করিঙ্গামান্নু কুজিয়িল মহম্মদ
অযোধ্যা খনন কার্যের পুরাতত্ত্ববিদ

শ্রীরাম মন্দিরের পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় দানের পর মন্তব্য

"আর তাঁবুতে নয়, এবার রামলালা বিরাজিত হন মন্দিরে। রাম মন্দিরের পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকারকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে।"

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা

রাম মন্দিরের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর মন্তব্য

"শুধু বিশ্বভারতীর পরিদর্শক হিসেবেই নয়, গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে আমি এসেছি একজন তীর্থযাত্রী হিসেবেও।"

রামনাথ কোবিন্দ
ভারতের রাষ্ট্রপতি

সম্প্রতি বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে

"অযোধ্যা সংক্রান্ত এই রায়কে জয়পরাজয়ের নিরিখে দেখা উচিত নয়। রামভক্তিই হোক আর রহিম ভক্তি, আসলে এসময় প্রয়োজন হলো রাষ্ট্রভক্তিকে সুদৃঢ় করা।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

রাম মন্দিরের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর দেশবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য

রাজ্য সরকারের স্বার্থপ্রণোদিত নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সক্রিয় হতে পারেন

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

এটা লক্ষণীয় যে, বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যপাল পদটা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর বহুকাল কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলোতে কংগ্রেসের একাধিপত্য থাকায় এই ধরনের বিরোধের অবকাশ ছিল না— রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী সমঝোতা করেই চলেছেন। কিন্তু ১৯৬৭ সাল থেকে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বহুদলীয় ব্যবস্থা দেখা দেওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্কের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে— দেখা দিয়েছে রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীর দ্বন্দ্ব।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজ্যপাল প্রশাসনের অপদার্থতা দেখে আধিকারিক বা পুলিশ অফিসারকে ডেকে খোঁজখবর করেছেন, কেউ কেউ সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে মুখ খুলেছেন, কেউ আবার অকুস্থলে গিয়ে অবস্থার সামাল দিয়েছেন।

এতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী, শাসকদলের নেতা-কর্মীরা ভীষণ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 'অতি সক্রিয়তা', সাংবিধানিক সীমা লঙ্ঘন ইত্যাদির অভিযোগ তুলেছেন।

কার কতটা সীমা, সেটা অবশ্য সংবিধানের বিষয়। তার জন্য সংবিধান বইয়ের মলাট ওল্টাতে হয় বলেই জানি।

প্রথমেই বলি— এম. এল. সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'he (The Governor) is not a mere ornamental emblem but a functionary designed to play a dynamic and active role'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৩৬)। কথাটা অনেকের পছন্দ না হলেও এটাই নির্মম সত্যি। সংবিধানের ১৫৪ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— তিনিই রাজ্যের শাসক-প্রধান। তবে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করার জন্য ('to aid and advise) রাজ্যে একটা মন্ত্রীসভা থাকে এবং আমরা ব্রিটেনকে অনুসরণ করে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি বলে অলিখিত নীতি অনুসারে রাজ্যপাল কিছুটা নেপথ্যে থাকেন--- প্রত্যক্ষভাবে শাসন চালায় মন্ত্রীসভাই।

বলা হয়, তাঁর ভূমিকা অনেকটা ব্রিটিশ রাজা-রানির মতো। কিন্তু কথাটার অর্থ স্পষ্ট নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ যেভাবে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, রানি ভিক্টোরিয়া, তৃতীয় ও পঞ্চম জর্জ সেভাবে ছিলেন না। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই সদর্থক ভূমিকা নিয়েছেন--- প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন। ভিক্টোরিয়া ১৮৫৭ সালে ভারতের মহাবিদ্রোহ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনকে সতর্কও করেছেন। স্যার আইভর জেনিংস লিখেছেন, 'She dose not steep the ship, but he must make it certain that there is a man at the wheel'— (দ্য কুইন'স গভর্নমেন্ট, পৃ. ৪৩)। ওয়াল্টার বেজটে মন্তব্য করেছেন, রাজা-রানির তিনটে বিশেষ ক্ষমতা আছে— উৎসাহ দেওয়া, খবর নেওয়া ও সতর্ক করা। সুতরাং আমাদের রাজ্যপালও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারেন পর্দার আড়াল থেকে। ড. এ.সি. কাপুরের ভাষায়— 'It is his duty to see that the sate Government functions in accordance with the constitutionn'— (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৩৬৭)। সুতরাং সরকারের স্বার্থ- প্রণোদিত নিষ্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় হতে পারেন— এটা আদৌ অতি সক্রিয়তা নয়।

কোনো বিষয়ে কেন্দ্রের নির্দেশ ও রাজ্য-ক্যাবিনেটের পরামর্শ ভিন্নধর্মী হলে রাজ্যপাল কেন্দ্রের নির্দেশই পালন করতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে বরখাস্ত করতে পারে— রাজ্য তা পারে না।

দ্বিতীয়ত, তাঁকে কলের পুতুল বলে দাবি করা হয়ে থাকে। তবে সব চেয়ে মজার কথা হলো— যাঁরা বিরোধী আসনে থাকার সময় বারবার সরকারের নীতি ও কাজের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার জন্য তাঁর কাছে ধরনা দেন, তাঁরা ক্ষমতায় বসার পর তাঁর পায়ে শিকল পরাতে চান, মুখ বন্ধ রাখতে বলেন।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, রাজ্যপাল সব ক্ষেত্রে মন্ত্রীর কথায় চলতে বাধ্য নন। মন্ত্রীরা পরামর্শ দেন, কিন্তু সংবিধান বলেনি যে, সেটা শুনতেই হবে। তার আসল কারণ— তিনি শপথ নেন, তিনি সংবিধান ও আইনকে রক্ষা করবেন এবং রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট থাকবেন (১৫৯ নং অনুচ্ছেদ)। তিনি আদৌ বলেন না যে, তিনি বর্ণে বর্ণে ক্যাবিনেটের কথায় চলবেন— তাঁর দায় সংবিধান ও আইনের কাছে, তাঁর লক্ষ্য জনকল্যাণ। সুতরাং তাঁর

যদি মনে হয় সরকারের কোনও কাজ বা নীতি সংবিধান ও আইনকে লঙ্ঘন করছে বা জনকল্যাণের বিরোধী, তাহলে তিনি তার বিরোধিতা করতেই পারেন।

এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, ১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদের মতোই রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল— রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রে একটা ক্যাবিনেট থাকবে— (৭৪ নং অনুচ্ছেদ)। কিন্তু সেই পরামর্শ রাষ্ট্রপতি মানতে বাধ্য কিনা, সেটা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু সংবিধানের ৪২তম সংশোধন এটাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে ১৯৭৬ সালে। ড. বিদ্যাধর মহাজন তাই লিখেছেন, রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শ এখন শুনতে বাধ্য— 'He has to do what the Ministers want him to do'— (দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া পৃ. ১৮৭)। কিন্তু রাজ্যপালের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

আরও বড়ো কথা হলো— সংবিধানের ১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদ তাঁকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দিয়েছে। যে যে বিষয়ে তিনি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ('discretionary power') ব্যবহার করবেন না, সেগুলোর ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেট পরামর্শ দেবে। সুতরাং একটা বিরাট ক্ষেত্রে আছে যেখানে তিনিই সিদ্ধান্ত লেখেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো— সংবিধান এটা নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং ১৬৩ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে--- রাজ্যপালই সেটা নির্ধারণ করবেন। যাঁকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাঁকে কিন্তু নামমাত্র শাসক বলা যায় না।

ড. পি.সি. রাউতের মতে, 'he is expected to exercise his discretionary power'— (ডেমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিইটউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২২২)। সেই জন্যই তিনি নিছক 'figurahead' নন।

ড. এম. ভি. পাইলি মনে করেন--- রাজ্যপাল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তাঁর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন—

(১) জটিল অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর মনোনয়ন।

(২) মন্ত্রীসভার পদচ্যুতি।

(৩) বিধানসভা আহ্বান ও ভেঙে দেওয়া।

(৪) ক্যাবিনেটের কাছ থেকে তথ্য জানা।

(৫) বিলে ভোটো দেওয়া বা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো।

(৬) অর্ডিনেন্সে স্বাক্ষর দেওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শ করা, এবং

(৭) জরুরি অবস্থা জারির জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়া।

তাঁর মতে, এভাবেই তিনি রাজ্য শাসনে একটা 'vital role' নিতে পারেন, কারণ তিনি আদৌ ঠুঁটো জগন্নাথ নন— (অ্যান ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২০৪-৫)।

তবে প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু এভাবে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাকে তালিকাবদ্ধ করতে চাননি। তাঁর মতো এটা নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপরে ('acceording to circumstances')— তিনি যে কোনো বিষয়কে তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলে জানাতে পারেন— (ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২১০)। আসল কথা হলো— সংবিধান তাঁকে এভাবে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে— প্রয়োজনে তিনি তা ব্যবহারও করতে পারেন। ড. এস.সি. কাশ্যপের ভাষায়— 'the Governor may have to use his own wisdom and discretion— (আওয়ার কনস্টিটিউশান, পৃ. ২১৪)।

এটা ঠিক যে, সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা ড. বি. আর. আম্বেদকর খসড়া সংবিধানের শেষ দিকে একটা অধ্যায় রেখেছিলেন— তার শিরোনাম ছিল 'ইন্সট্রুমেন্ট অব ইন্সট্রাকশান্স'। তাতে ছিল রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে চলবেন। সেটা থাকলে রাজ্যপালের ক্ষমতাও খর্ব হয়ে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অধ্যায়কে বাদ দেওয়া হয়েছে। আসলে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গৃহীত হলেও একটা পার্থক্য রয়েছে। রাজ্যপালকে মনোনীত করেন রাষ্ট্রপতি— তিনি তাঁকে সরিয়েও দিতে পারেন যে-কোনও মুহূর্তে। ডাবলিউ. এইচ. মরিস জোন্স মনে করেন, এভাবেই রচয়িতারা দেশের 'structural unity' রক্ষা করতে চেয়েছেন— (গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৮০)। সুতরাং কোনো বিষয়ে কেন্দ্রের নির্দেশ ও রাজ্য-ক্যাবিনেটের পরামর্শ ভিন্নধর্মী হলে রাজ্যপাল কেন্দ্রের নির্দেশই পালন করতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে বরখাস্ত করতে পারে— রাজ্য তা পারে না।

এই সব কারণে অনেক সময় কোনও কোনও রাজ্যপাল কিছুটা সক্রিয়তা দেখাতে পেরেছেন। ১৯৬৯ সালে কেরলের রাজ্যপাল 'কেরল অ্যাডুকেশন বিল'-এ স্বাক্ষর দেননি, তাঁর ধারণাটা সুপ্রিম কোর্টেও অনুমোদিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধর্মবীর মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেছিলেন। সেটাও হাইকোর্টের অনুমোদন পেয়েছিল। একবার মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল বিধানসভা থেকে এক সদস্যকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। ১৯৮২ সালে হরিয়ানার রাজ্যপাল জি.ডি. ভাপাসে মুখ্যমন্ত্রী-পদের দুই দাবিদার ভজনলাল ও দেবীলালকে রাজভবনে অনুগামীদের সংখ্যা গণনার জন্য হাজির হতে বলেছিলেন— (জি. এস. পাণ্ডে— কনস্টিটিউশান ল অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৪১)। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল উমাশঙ্কর দীক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে ক্যাবিনেটের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছিলেন। কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে। অনেক রাজ্যপাল বৃহত্তম দলের নেতার দাবি অগ্রাহ্য করে কোয়ালিশন সরকার গড়েছেন।

এগুলো আদৌ ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন নয়। আরও বড়ো কথা হলো— রাজ্যপাল তাঁর গণ্ডি ছাড়িয়েছেন কিনা, সেটা মন্ত্রী-নেতার বিচারের কথা নয়— কাজটা সংবিধানই করে রেখেছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মুক্ত বাণিজ্যে মুক্তি নাস্তি

শেখর সেনগুপ্ত

সত্য কথাটা সরাসরি বললে বলতে হয়, তাবৎ বিশ্বে কোনও দেশেরই আর্থিক অবস্থা এই মুহূর্তে এমন জোরালো নয় যে সে অপরের বাণিজ্য দরিয়ায় ঢুকে কাপ্তেনি করবে। এই অবস্থাতে একাধিক দেশ নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে যূথবদ্ধ হয়ে পরস্পরের বাজারে অবাধে ঢোকার ও বের হয়ে আসবার পুরানো যুক্তি আওড়াতেই পারে। জগৎসুদ্ধ সকল দেশ নয়, ওই যূথবদ্ধতা বহুলাংশে আঞ্চলিক এবং সেই ব্যবস্থাপনায় শেষাবধি দেখা যায় যে লাভের গুড় মুখ্যত একটি বা দুটি অথবা তিনটি দেশ রত্নখচিত পিপিলিকা হয়ে চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলি এমত বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর ক্রমে দেখা গেল যে ওই ব্যবস্থায় লাভবান না হয়ে কতিপয় দেশ বাণিজ্যিক তথা আর্থিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় কম-বেশি বিহ্বল।

চোখের সামনে এই রকম নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও ভারত সমেত ষোলোটি দেশ অনুরূপ একটি সঙ্ঘ গড়ে তোলার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছিল। চুক্তিপত্রের বয়ান প্রস্তুত, এবার গঙ্গাবারিতে শুদ্ধ হয়ে তাতে স্বাক্ষর দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। সেই গোষ্ঠীবদ্ধ 'প্রীতিময়' মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির নাম Regional Comprehensive Economic Partnership। দেশের বিজেপি সরকার প্রথমে ভেবেছিল, এই ধরনের অবাধ বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ১৬টি দেশের পক্ষেই স্বাস্থ্যকর হবে এবং আর্থিক উন্নয়ন গাঢ়তর হবে, বাড়বাড়ন্ত ঘটবে। কিন্তু পরিণতি যে বিপরীতমুখীই হতে পারে, ঝানু অর্থনীতিবিদরা তাঁদের বিশ্লেষণে সেই গূঢ়সম্ভাবনাকে সামনের দিকে টেনে আনলেন। দেশের স্বার্থরক্ষায় যারা সর্বাধিক সচেতন ও সক্রিয়, সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও এই চুক্তিকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করবার পর সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে ওই প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির শামিল না হতে, যদিও ভারতই প্রথম দিকে খুব উৎসাহী ছিল ওই প্রচ্ছন্ন খতরনাক চুক্তির গুণাবলীকে ব্যাখ্যা করতে। অনেকে ঘৃণাক্ষরেও টের পাননি, কী ধরনের গড্ডায় পড়তে চলেছে দেশ। যেমন ধরুন, ওই প্রস্তাবিত চুক্তির দুই সম্ভাব্য শক্তিশালী দেশ হলো চীন ও ভারত। আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে জানি, বহু দুর্জন কারবারি ভারত-চীন বর্ডার টপকে অনেককাল ধরেই তুলনায় অনেক সস্তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিতান্ত পলকা চৈনিক দ্রব্যাদি ভারতের বাজারে ঢুকিয়ে এ দেশের বাণিজ্যিক ও আর্থিক বুনিয়াদের ক্ষতি করে চলেছে। অতঃপর ওই বেআইনি অনুপ্রবেশই নীতিসিদ্ধ আইন মোতাবেক কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে। ভারতের শিল্পসম্ভাবনা মার খাবে, যারা ছিল প্রকৃত দুর্জন, তারাই হয়ে উঠবে আদত নিয়ামক। উচ্চারণ করি সেই শাস্ত্রীয় বচন—

দুর্জনং প্রথমে বন্দে, সুজনং তদন্তরম্।
মুখ প্রক্ষালং পূর্বে গুহা প্রক্ষলনং যথা।।

চীনে শ্রমিকদের নির্বিচারে শোষণ করা হয়। প্রায় পেটচুক্তিতে তাঁদের কাজ করতে হয়। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় চৈনিক দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয় কথঞ্চিৎ। অন্যদিকে আমাদের দেশে সরকার শ্রমিক আন্দোলনকে সর্বদাই মান্যতা দেয়। শ্রমিকদের সাধ্যানুসারে বেতন বৃদ্ধি ঘটে। তাই জলের দরে উৎপাদিত বস্তুকে বাজারজাত করতে না পেরে ভারতের শিল্পোৎপাদনের পরিধি ও সম্ভাবনা নাগাড়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে চৈনিক দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে না পারায়। কৃষিক্ষেত্রেও বিপদ ঘনিয়ে আসবে। গম, আখ, যব, ধান, ফলফলাদি ইত্যাদির উৎপাদনে ব্রতী কৃষকরা উপযুক্ত বিক্রয়মূল্য না পেয়ে গ্রাম ছেড়ে আরও বেশি সংখ্যায় শহরের দিকে ছুটবেন। দেশে কর্মহীন ভিখিরিদের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বারোটা বাজিয়ে দেবে ভারতের ডেয়ারি শিল্পকে।

গত সাত বছর ধরে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিস্তর আলোচনা চললেও এমন কথা কখনও বলা হয়নি যে, কোনও দেশের অর্থনীতি এই চুক্তির ফলে ভেঙে পড়লে চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য শরিকরা তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসবে। তাই আসিয়ানভুক্ত দেশগুলি এখন চীনকে তোল্লা দিয়ে যতই চুক্তির গুণকীর্তন করুক, ভারত যেন চুক্তি থেকে নিজেকে দূরে রাখতেই মনস্থ করে। কংগ্রেস, বামপন্থী দলগুলি এই চুক্তির স্বপক্ষে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলতে পারে জনসমক্ষে। কিন্তু তাদের যথার্থ হিসেবে আমরা সাব্যস্ত করতে পারি না। একেবারে হামলে না পড়লেও প্রথমাবস্থায় যথেষ্ট পরিপাটি সহকারে বিজেপি সরকার এই চুক্তির অনুকূলে বাক্যজাল বিস্তার করছিল। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আমাদের দেশের যিনি এই মুহূর্তে কর্ণধার, মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত বিবেচক। সমস্যার সৃষ্টি হলে যেমন তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন না বা ভুলভাল তথ্য সাজিয়ে নর্তনে রত থেকে মানুষকে বল-ভরসা জোগাবার যৎপরনাস্তি নাটক করেন না, তেমনি অনেক ভাবনার অতলান্তে ডুব দিয়ে প্রকৃত সত্যকে টেনে আনতে জানেন। তিনি কতটা ডিপ্লোম্যাটিক, তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ কম। জনগণের অগাধ আস্থা তাঁর ওপর থাকায় হরেক কিসিমের প্যাঁচপয়জারের বাতাবরণ তৈরির দরকার এই দেশনায়কের এ যাবৎ হয়নি। তাই চুক্তিতে আগ্রহী বাকি ১৫টি দেশকে শেষাবধি তিনি জানিয়ে দিলেন, 'অল্প তফাতে থেকেও আমাকে অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার বিবেক এবং মহাত্মা গান্ধীর সত্যান্বেষণ কপালের জটিল ভাঁজগুলিকে মুছে দিয়েছে। ভারত সরকার সবদিক বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করছে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে।'

(লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী)

এশিয়ার মুক্ত বাণিজ্য থেকে সাময়িক আত্মরক্ষা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ সংক্ষেপে আরসিইপি প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে অনেকেই জেনেছেন। বুনিয়াদি হিসেবে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চালাবার জন্যই ২০১২ সালে ইউপিএ-২-এর আমলে ভারত এই সংগঠনটির সদস্য হতে যায়। ২০১২ থেকে আজ অবধি এই আর সি ই পি-এর অন্তর্গত ১৬টি দেশ অর্থাৎ ১০টি Association of South East Asian Nation (Aseon Countries) যার মধ্যে রয়েছে কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, মায়নামার, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড। একই সঙ্গে জাপান, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে ধরলে এই ১৬টি দেশ পরস্পরের সঙ্গে আরসিইপি আবদ্ধ হলে বিশ্বের মধ্যে তারাই বৃহত্তম সংগঠিত একটি ব্লক বলে গণ্য হতো।

২০১২ সালের আইএমএফ-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আরসিইপি-এর দখলে বিশ্বের ৪০ শতাংশ বাণিজ্য। চীন ভারতের মতো দেশ থাকায় জনসংখ্যায় যা ৪৫ শতাংশ। তাহলে হলো না কেন? এখানে মূল প্রশ্ন উঠবে দুটি—(১) ভারতীয় অর্থনীতি পিছিয়ে পড়ার কারণ হয়ে উঠবে মূলত সস্তা দামের চীনা জিনিসের আরও ব্যাপক হারে বাজারে ঢুকে পড়া। দ্বিতীয়ত ভারতের যে নড়বড়ে ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার পক্ষে তুলনামূলকভাবে উৎপাদনশীলতার অযোগ্যতা। যেমন চীন বা জাপানে যে মালটা ১০ টাকায় তৈরি হচ্ছে একই পরিমাণ ফ্যাক্টরস অব প্রোডাকশন দিয়ে যেমন— ৪ টাকা মূলধন, ২ টাকা দোকান ভাড়া, ২ টাকা মজুরি, মালিকের ২ টাকা লাভ রেখে মোট ১০ টাকায় ১০টা দেশলাই বাক্স তৈরি হলো। প্রত্যেকটা ১ টাকায় বিক্রি করলেই Break even বা অর্থনৈতিকভাবে সাকার একটি প্রকল্প চলতে পারে। কিন্তু ভারতে একই পদ্ধতিতে ৭টি দেশলাই বেরোল। অর্থাৎ উৎপাদনশীলতায় খামতি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যার ফলে ব্যবসা চালু রাখতে গেলে প্রতিটি দেশলাই অন্তত ১.৪৫ পয়সা করে বিক্রি করতে হবে।

আরসিইপি দেশগুলির মধ্যে রপ্তানির প্রতিযোগিতায় চীন বা বাংলাদেশ ১ টাকা বা ৯০ পয়সা দরে দেশলাই সরবরাহ করে ৫০০ কোটি টাকার দেশলাই সরবরাহের বরাতটা ধরে নেবে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে উদাহরণ দিয়ে বলা যায় চীনের ভারতে রপ্তানি ৭০.৩ বিলিয়ন ডলার। ভারতের চীনে রপ্তানি ১৬.৮ বিলিয়ন ডলার। টাকার অঙ্কে বাণিজ্যের ঘাটতি ৫৪০০ কোটি ডলার। বাজারে লোকে বলে, এটা কি চীনের মাল নাকি? তাহলে তো দুদিন পরেই ফেলে দিতে হবে' বলার পরও তাৎক্ষণিক দাম ভয়ংকর কম হওয়ায় কমদামি ইস্পাত, নানা ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, এই দীপাবলীতে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের তরফে বারবার প্রচার সত্ত্বেও চোখ ধাঁধানো আলো অবলীলায় কিনে নিয়ে গেছে। নীচে ভারতের সঙ্গে ১০টি আসিয়ান দেশ-সহ মোট ১৬টি দেশের ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের প্রতিকূল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খতিয়ান দেওয়া হলো।

এখানে FTA বা Free Trade Agreement-এর প্রসঙ্গ জরুরি। আগে বলা হয়েছে ১০টি এসিয়ান দেশের বাইরে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ৬টি দেশের সঙ্গে আমাদের আলাদা চুক্তি মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি চলছে। প্রতিটি দেশের সঙ্গেই আমাদের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নেতিবাচক। এই দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে আমদানি শুল্ক উভয়দেশ পারস্পরিক ভাবে ঠিক করে। এখন RCEP-এর ১৬টি দেশ পূর্ণ মুক্ত বাণিজ্য মারফত এই আমদানি শুল্কের হার কমিয়ে দিতে চাইছে। অর্থাৎ আমদানি শুল্ক ভারত নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট বস্তুর দাম এমন জায়গায় রাখার চেষ্টা করে যাতে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মার না খায়। অনেক সময়ই সক্ষম হয় না, ভারত যে 'Make

in India' প্রকল্পে হাত দিয়েছে তার মূল উদ্দেশ্যই তো রপ্তানি নির্ভর। ভারতের অভ্যন্তরে তো বিক্রি হবেই, ব্যাপক রপ্তানিও করতে হবে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন 'manufacture, export or perish'. ৫ ট্রিলিয়নের অর্থনীতির লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে ব্যাপক উৎপাদন চাই। সেখানে যদি আরসিইপি-তে প্রস্তাবিত আমদানি শুল্ক আরও কমিয়ে দেওয়া হয় ফলে সস্তামালের অনুপ্রবেশ হয়— মেক ইন ইন্ডিয়া কিনবে কে। সারা দেশ ও বিদেশ নিয়ে আমূলের ৩৮ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে দুগ্ধজাত উৎপাদন প্লাবনের হারে চলে। তাদের ভারতে অবাধ গতি যদি রোখা না যায় আমুলের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কত দূর সম্ভব হবে? দেশীয় গোয়ালারা কাদের দুধ বিক্রি করবে? এগুলি বড়ো মাথাব্যথা ও অর্থনীতির বিপদের কারণ হওয়ার ক্ষমতা ধরে। একই রকম পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু WTO-এর ক্ষেত্রেও। সেখানে অতি সম্প্রতি WTO-এর তরফে একটি মার্কিন দাবির যৌক্তিকতা মেনে রায় দেওয়া হয়েছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত তার সংসস্থাগুলিকে যে সমস্ত ছাড় বা সুযোগ সুবিধে দিচ্ছে তা WTO চুক্তির বিরোধী। যেমন ধরুন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতে পারলে সরকার উৎপাদককে কিছুটা এক্সপোর্ট ডিসকাউন্ট বা ভরতুকি দিয়ে দেবে। আগে এমন বহু শিল্পদ্যোগ খোলা হয়েছে যেগুলি কেবলমাত্র এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড। যার ফলে ব্যাপক ছাড়ের অধিকারী। পরিণতিতে তাদের দাম কমে যাচ্ছে ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাড়তি সুবিধে পাচ্ছে। এখানেই আপত্তি উঠেছে।

একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার, এই ধরনের বাদানুবাদ আপোস, মীমাংসা বিশ্ব বাণিজ্যে থাকবেই। কিন্তু রাগ করে পুরো জানালা কোনো দেশই বন্ধ করতে পারবে না। কালকেই দিল্লিতে পিঁয়াজ আবার ৯০ টাকা কিলো হয়েছে। সরকার কম দামে পিঁয়াজ আমদানির অর্ডার দিয়েছে।

RCEP থেকে বেরোলেও ভারতকে প্রথমেই ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে FTA নিয়ে প্রস্তাবিত আলোচনা দ্রুত শুরু করতে হবে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি বাড়তে থাকলে যা বেড়ে চলেছে তা সামগ্রিক fiscal deposit-এর মাত্রা যা ৩.৩ শতাংশে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে ধরে রাখা যাবে না। অর্থবর্ষের প্রথম ৬ মাসেই তা লক্ষ্যমাত্রার ৭৮ শতাংশ ছুঁয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা অর্থনীতির সামগ্রিক দুর্বলতার সূচক। বাঁচার রাস্তা এখন একটাই, কেননা ভারতের পক্ষে RCEP-তে থাকা আর না থাকা বাস্তবে শাঁখের করাত। আমদানি শুল্ক কমাবো না বলে চলে এলাম। কিন্তু রপ্তানি তো করতেই হবে। আর আমদানি তো সব দেশের সঙ্গে বন্ধ রাখলে চলবে না। আমার আলপিন তৈরির খরচা ২ টাকা হলে আমদানি তো করতেই হবে। রাফেল বিমানের প্রযুক্তি কি আমার আছে? রাস্তাটা হচ্ছে দেশের উৎপাদনের উপাদানগুলির ব্যাপক কাঠামোগত সংস্কার (Stractural reform)। স্বস্তিকার পাতায় নীতি আয়োগের পূর্বতন অধিকর্তা অরবিন্দ পানাগাড়িয়া, সদানন্দ ধুমের মতো অর্থনীতিবিদ বারবার সেকথা লিখেছেন।

নিদেন হিসেবে খুব সংক্ষেপে সেগুলিকে আবার উল্লেখ করছি।

(১) সস্তা দরে মূলধন পেতে ব্যাঙ্কের সুদ ও হ্যাপা কমানো।

(২) শ্রম আইন সংশোধন করে গুজরাটের মতো পূর্বে চুক্তি সম্পাদন করে শ্রমিক নিয়োগ। যাতে যে কোনো দাবি দাওয়ায় কারখানা বা উৎপাদন যেন বন্ধ না হয়ে যায়। চাকরি থাকা বা না-থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার মালিকের।

(৩) জমি সংগ্রহের ব্যাপারে আইন সংশোধন। মান্দাসোরে সরকার বড়ো উদ্যোগের জন্য জমি নিতে গেলে বিরোধী আন্দোলন তা ভণ্ডুল করে দেয়।

(৪) ব্যবসা চালুর স্বাচ্ছন্দের সূচিতে ভারত অনেকটা এগোলেও দূষণ ছাড়পত্র থেকে বর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থা প্রভৃতি আরও বহু কিছুর অনুমোদন দিতে ১৮ মাসে বছর না হলেও ১৪ মাসে তো হচ্ছেই।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৫ সালে আরসিইপি-এর সমগোত্রীয় বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য সংগঠন WTO তৈরির সময় ভারতের মাথা পিছু আয় ছিল ৩৫০ ডলার, চীনের ৫৯২ ডলার। বলা হয়েছিল 'Both were called biggest beggers."

আজ ২০১৯ সালে আমার সেই ভিখিরি ভাইয়ের মাথা পিছু আয় ৯০০০ ডলার ছুঁয়েছে। ভারতের ২০০০ ডলারের সবই কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্য। চীন ডান্ডা ঘুরিয়ে, নির্যাতন করে স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে শিখর ছুঁয়েছে। ঠিক কথা। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতকে তো অর্ধেকটাও যেতে হবে। সে পথের পাথেয় নিজেকে সংস্কারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষুরধার করে তোলা। কেননা লক্ষ্য ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি।

ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি (২০১৮-১৯)

	আমদানি	রপ্তানি	বাণিজ্য ঘাটতি বিলিয়ন/মার্কিন ডলার
চীন	৭০.৩	১৬.৮	৫৩.৫
অসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশ	৫৯.৩	৩৭.৫	২১.৮
দক্ষিণ কোরিয়া	১৬.৮	৪.৭	১২.১
অস্ট্রেলিয়া	১৩.১	৩.৫	৯.৬
জাপান	১২.৮	৪.৯	৭.৯
নিউজিল্যান্ড	০.৬	০.৪	০.২

মোট আমদানি ১৭২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট রপ্তানি ৬৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
মোট ঘাটতি ১০৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

আরসিইপি বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি জাতীয় অর্থনীতির নিঃশব্দ ঘাতক

অম্লান কুসুম ঘোষ

নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণীকে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র যেমন আলোড়িত করে তোলে সেরকমই সরকারের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত অনেক সময় দেশের সংবাদমাধ্যম ও জনমানসকে আলোড়িত করে তোলে। সম্প্রতি ভারত সরকার আরসিইপি নামাঙ্কিত এক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থেকে পিছিয়ে এসেছে। দেশের সংবাদমাধ্যম ও জনমানস বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে আলোড়িত। আরসিইপি কী? দেশের অর্থনীতির উত্থান পতনে তার ভূমিকাই বা কতটা? জনমনে এই প্রশ্ন আজ সদাজাগ্রত।

আরসিইপি (R.C.E.P. বা Regional comprehensive economic partnership) হলো সম্ভাব্য ষোলোটি দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হলো ১৬টি দেশের মধ্যে একটি সুসংহত বাজার তৈরি করা। এর ফলে এই দেশগুলির উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবা অন্য দেশে পাওয়া সহজতর হবে। এই ষোলোটি দেশের মধ্যে আসিয়ানের অন্তর্ভুক্ত দশটি দেশ আছে, দেশগুলি হলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ব্রুনেই, ভিয়েতনাম, লাওস, মায়ানমার, কম্বোডিয়া। এছাড়া আরও যে ছটি দেশ এর মধ্যে বর্তমান সেগুলি হল জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও চীন। এই ষোলোটি দেশের মিলিত জনসংখ্যা ৩৪০ কোটি যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ আর ক্রয়ক্ষমতার সূচক (পারচেজিং পাওয়ার ক্যাপাসিটি) অনুযায়ী এই ষোলোটি দেশের মিলিত জিডিপি হলো ৪৯.৩ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার যা বিশ্বের মোট জিডিপি-র ৩৯ শতাংশ এবং মোট বিশ্ববাণিজ্যের ৩০ শতাংশ। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে কম্বোডিয়াতে আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলনের তত্ত্বাবধানে প্রথম এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আনা হয়েছিল। এই চুক্তির নিয়মানুসারে উক্ত ১৬টি দেশ থেকে আসা পণ্য ও পরিষেবার ওপর ইমপোর্ট ট্যাক্স অত্যন্ত কম এবং কখনও কখনও শূন্য করে দেওয়া হবে।

বর্তমানে যে কোনো দেশ থেকে ভারতে যখন কোনো পণ্য আমদানি হয় তখন সেই পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক এবং কখনও কখনও অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি দিতে হয়। তা সত্ত্বেও চীন তার আগ্রাসী অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে ভারতের বাজারকে গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত। এমনিতেই বর্তমানে চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বছরে চার লক্ষ কোটি টাকার কিছু বেশি। বর্তমানে শুল্কের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চোরাপথে ভারতের বাজারে অনুপ্রবেশ করেই চীন বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি করে ফেলেছে। আরসিইপি-মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আশ্রয় পেলে চীন ভারতের বাজারকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিত তার সস্তায় উৎপন্ন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদির দ্বারা। অপরদিকে জাপান প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারত থেকে অনেক উন্নত, তারা উন্নত প্রযুক্তির ভোগ্য সামগ্রী নির্মাণ করে সেই ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা ভারতের উচ্চবিত্ত বাজারটি সম্পূর্ণ দখল করে ফেলত। এক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়াও সমানতালে পা ফেলত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এই দুই দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রযুক্তিবিদ্যায় বর্তমানে গোটা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এবং ইউরোপ ও ইউরোপের এককালীন প্রযুক্তিবিদ্যার শ্রেষ্ঠ দেশ জার্মানি এমনকী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত উৎপাদিত সামগ্রীর লড়াইয়ে এদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, সেখানে আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ শিল্পগুলির কী হাল হতো এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তা বলাই বাহুল্য। শিল্পের ওপর

নির্ভরশীল দেশের কুড়ি শতাংশ মানুষ (সংখ্যায় প্রায় পঁচিশ কোটি) জীবিকাচ্যুত হতেন। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এই দেশগুলি পশুপালনে উন্নত। তার নানাবিধ কারণও আছে। অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ৭৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা মাত্র দু'কোটি, সেখানে ভারতের আয়তন ৩৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৩০ কোটি। অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ভারতের আড়াই গুণ আর জনসংখ্যা মাত্র ৬৫ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এ কথা বলা যায় অস্ট্রেলিয়ায় বহু জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। ফাঁকা জায়গা থাকার কারণে সেখানে প্রচুর পশুচারণভূমি পাওয়া যায় এবং স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশুখাদ্য অনেক বেশি পাওয়া যায়। পশুপালনের মাথাপিছু খরচ তাই সেখানে অনেক কম। ফলে পশুপালন করা সেখানে তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। সেজন্য মাথাপিছু পশুর সংখ্যা সেখানে অনেক বেশি। পক্ষান্তরে জনবহুল ভারতে তুলনামূলকভাবে পশুচারণভূমি এবং স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশুখাদ্য অনেক কম, তাই পশুপালনের মাথাপিছু খরচ ভারতে বেশি। মাথাপিছু পশুর সংখ্যাও তাই ভারতে কম। দুগ্ধজাত বা পালিত পশুজাত অন্যান্য দ্রব্যের দাম ভারতে অনেক বেশি। আরসিইপি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বলে বলীয়ান অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের পশুপালকরা যদি ভারতের বাজারে নিঃশুল্ক অবস্থায় প্রবেশ করে তাহলে ভারতের ১০ কোটি পশুপালক তাদের বাজার হারাবে ও কর্মচ্যুত হবে।

বিপদের এখানেই শেষ নয়। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ব্রুনেই, ভিয়েতনাম, লাওস, মায়ানমার, কম্বোডিয়া আসিয়ানের এই দশটি দেশ কৃষিতে অত্যন্ত উন্নত। তাদের উৎপন্ন সস্তার ফসল নিয়ে তারা বিশ্বের যে কোনো বাজার দখলে মরিয়া। তাদের হাত থেকে নিজেদের কৃষকদের রক্ষা করার জন্য উদার অর্থনীতির প্রবক্তা পশ্চিমি দেশগুলি এমনকী WTO পর্যন্ত এই দেশগুলির ফসলকে তাদের মুক্ত বাণিজ্যের আওতায় আনেনি। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে এই দেশগুলি যদি ভারতের বাজারে প্রবেশ করতো তাহলে ভারতের কৃষিক্ষেত্র সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল দেশের ষাট শতাংশ মানুষ (সংখ্যায় প্রায় আশি কোটি) জীবিকাচ্যুত হতেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে ভারতের কৃষি, পশুপালন ও শিল্পের ওপর নির্ভরশীল প্রায় একশো কোটি মানুষের জীবন সংকটাপন্ন হতো।

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পক্ষাবলম্বীদের বক্তব্য ছিল ভারতের পরিষেবা ক্ষেত্র এর ফলে বিস্তৃত বাজার পেয়ে লাভবান হবে। একথা সত্য যে উপরোক্ত দেশগুলির তুলনায় ভারত পরিষেবা ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। তাই চুক্তির ফলে ভারত পরিষেবা ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত বাজার পেতে পারতো। কিন্তু পরিষেবা ক্ষেত্র যেহেতু বস্তুনির্ভর নয় বরং মানুষনির্ভর, তাই পরিষেবা ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড়াও অন্যান্য নানান পদ্ধতির দ্বারা (যেমন পাসপোর্ট ভিসায় লাগাম দেওয়া ইত্যাদি) অন্য দেশগুলি ভারতকে আটকে দিতে পারতো। তাছাড়া পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল মাত্র কুড়ি শতাংশ। তিরিশ কোটি লোকের সুবিধার জন্য বাকি একশো কোটি মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি করা অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার নিদর্শন নয়।

মনমোহন সরকার অবিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে আরসিইপিতে গিয়েছিলেন। বর্তমান সরকারের দায়িত্ব ছিল সেই ভুলের স্খালন করা। প্রথম দিকে বর্তমান সরকারও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল আরসিইপি নিয়ে, কিন্তু স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ আরসিইপির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আন্দোলনরত ছিল। অবশেষে ভারত ভাগ্যবিধাতা সঠিক পথাবলম্বন করলেন, সরকার পিছিয়ে এল আরসিইপির থেকে। দেশ রক্ষা পেল ভয়ংকর অর্থনৈতিক বিনাশের হাত থেকে।

নতুন প্রজন্ম মুখ ফেরাচ্ছে বহুরূপী শিল্প থেকে

তিলক সেনগুপ্ত

'মহারানি কটকটি গাড়ি চালায় ভটভটি'...এই বুলি আওড়াতে আওড়াতে দৌড় লাগান অমৃতবাঁকে দাঁড়ানো বাসের দিকে। আজ যে তাঁকে যেতে হবে সাঁইথিয়ায়। ঠিক পেছনেই তখন পাগলের সাজে গলা দিয়ে বিকট আওয়াজ করতে করতে গ্রাম ছাড়েন উত্তম। তারপরেই সাইকেল চেপে 'ডাকাত সর্দার' নয়ন রওনা দেন কীর্ণাহারের দিকে। সাজ সেজে নিলেই যন্ত্রণা, কষ্ট দুর্দশা সব যেন নিমেষে উধাও এই সকল 'বহুরূপী'দের জীবন থেকে। কারণ এখন তাদের লক্ষ্য একটাই, মানুষকে আনন্দ দেওয়া। বহুরূপী শিল্পীদের কথায়, মানুষকে আনন্দ দিয়েই তো ঢেকে রাখি আমাদের জীবনের যন্ত্রণা, শত কষ্টকে।

প্রতিদিন-ই নিত্যনতুন সাজ নিয়ে গ্রামবাঙ্গলার পাড়ায় পাড়ায়, শহরের আনাচে কানাচে দেখা মিলত বহুরূপীদের। যাদের অপেক্ষায় থাকত গ্রাম শহরের মানুষেরা। কিন্তু আগামীদিনে আর কি পাওয়া যাবে এই সকল শিল্পীদের দেখা? বহুরূপীদের গ্রাম বলে পরিচিত বীরভূমের লাভপুরের বিষয়পুরের ব্যাধ পাড়ার 'বহুরূপীদে'র কথায় কিন্তু অশনি সংকেত। কারণ তারা আর চায় না যে পরবর্তী প্রজন্ম আর আসুক এই শিল্পে। কারণ তিন পুরুষ ধরে বহুরূপী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এই সকল ব্যাধদের যন্ত্রণা, 'তারা আজ আর শিল্পী নন। তাদের জীবন হয়ে উঠেছে ভীক্ষুকের জীবন।'

সকাল ছ'টা বাজতে না বাজতেই বিষয়পুর গ্রামের অমৃতবাঁক মোড়ে এসে দাঁড়ায় বাস। ভোর রাতে উঠে দু-মুঠো পান্তা মুখে দিয়েই সীতারাম, সঞ্জিত, অশোক, বাবুরা লেগে পড়ে মুখে রং লাগাতে। এক এক দিন এক রকম রং। যে সাজের সঙ্গে যে রং মানায়। কোনোদিন রামচন্দ্র, মহাদেব, পাগলা খ্যাপা তো কোনোদিন ডাকাত সর্দার তো কোনোদিন লালন ফকির। সাত সকালেই বাস ধরে জেলার এপ্রান্ত, এপাড়া থেকে ওপাড়া ঘুরে ঘুরেই তো এঁদের দিনগুজরান। গলা ছেড়ে নানা বুলি আওড়ে মানুষকে খুশি করাই তো এঁদের কাজ। বিনিময়ে যার কাছ থেকে যা মেলে তাই দিয়েই দিন গুজরান। কোনোদিন একশো, তো কোনোদিন দু-শো আবার কোনোদিন খালি হাতেই মনমরা হয়ে ফিরে আসতে হয় গাঁয়ে।

লাভপুরের চৌহাট্টা মোড় বাঁ-দিকে কয়েক কিলোমিটার গিয়েই হাতিয়া মোড়। সেখান থেকে পিচ রাস্তার ধরে এক কিলোমিটার গেলেই বিষয়পুর গ্রাম। যার পশ্চিম প্রান্তেই রয়েছে 'ব্যাধ'-দের বাস। গত তিন পুরুষ ধরে তাদের পেশা-'বহুরূপী'। এখনও ৪০-৫০ ঘর রয়েছে যাদের দিন চলে সারা শরীরে রং মেখে, মোটা কাপড়ের রং বেরঙের তাপ্পি দেওয়া পোশাক পড়ে দিনভর ঘুরে ঘুরে নানা অভিনয় করে। যা দেখে আনন্দ নেয় সবাই।

ব্যাধপাড়ার পুকুড়পাড়ে দাঁড়াতেই এবাড়ি ওবাড়ি থেকে গুটি গুটি পায়ে জড়ো হয়ে যান শিল্পীরা। তাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গ্রামের প্রবীণ বহুরূপী শিল্পী আনন্দ চৌধুরী ব্যাধ। গত ৫৫ বছর ধরে রয়েছেন এই শিল্পে। একরাশ হতাশা তাঁর গলায়, 'কী পেলাম জীবনে। এখন তো শিল্পী বলেও মানে না। একটি শিল্পীর কার্ড পেয়েছি বটে। ঘরে টাঙিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।"

বীরভূমের লোক গবেষক ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় কথায়, 'তখন নবাবি আমল। মুর্শিদাবাদের ব্রজেশ্বর রায়ের হাত ধরে বীরভূমে বহুরূপী প্রচলন হলো। প্রবীণ শিল্পী আনন্দ চৌধুরী ব্যাধের পূর্বপুরুষ ফুলছড়ি ব্যাধের হাত ধরেই এলাকায় এই শিল্পের বিস্তার। তবে এখন নতুন প্রজন্ম এই শিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যেটা সত্যিই খুব উদ্বেগের। ধরুন একজন শিব সেজেছে। তাকে হাত পেতে পেতে বা ঝোলা বাড়িয়ে পয়সা চাইতে হচ্ছে। প্রকারান্তরে ভিক্ষা চাওয়া। যা নতুন প্রজন্ম মানতে চাইছে না। ফলে তারা ছেড়ে দিচ্ছে এই শিল্প ধারা। আগামী দিনে হয়তো হারিয়েই যাবে।'

গত তিন পুরুষ ধরে এই পেশায় রয়েছে ব্যাধ সম্প্রদায়ের মানুষ। একশো বছরেও বেশি সময় অতিক্রান্ত এই পেশায়। আগে বনের ফুল তুলে বাজারে বিক্রি, বন্য পাখি শিকার করা। ধনেশ পাখির তেল বিক্রি করত। বনের কাঠ সংগ্রহ, জরি-বুটি বানিয়ে তা বিক্রি করাই ছিল এঁদের পেশা। পরবর্তী সময়ে বলিষ্ঠ চেহারার ব্যাধ সম্প্রদায়ের ডাক পড়ত জমিদার-জোতদারদের লেঠেলের কাজে। কারণ যোদ্ধা হিসাবে এঁদের সুনাম ছিল সেই সময়। তারপর ধীরে ধীরে তাদের প্রবেশ ঘটে বহুরূপীর শিল্পে। বিষয়পুরে ব্যাধদের বাড়ি উঠানে বসে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা জিজ্ঞাসা করতেই আক্ষেপের সঙ্গে রাজেন্দ্র চৌধুরী ব্যাধ জানান, ''আর দিন চলে না। ভোর থেকে পায়ে হেঁটে দরজায় দরজায় ঘুরে কি পরিশ্রমটাই না হয় সারাদিন। কোনোদিন খাবার জোটে তো জোটে না। দিনের শেষে উপার্জনের কোনো ঠিক থাকে না। হরেক রকমের রং, নানা ধরনের পোশাক কেনারও তো খরচা আছে। কিন্তু বহুরূপী সেজে হাত না পাতলে আর নিজে থেকে কেউ পয়সা দেয় না।"

সরকারি সাহায্য, শিল্প পরিচয়পত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে রাজেন্দ্র আক্ষেপের সঙ্গে জানায়, আজও আমি শিল্পীর সরকারি পরিচয় পত্র পাইনি। ব্যাধ পাড়ার আক্ষেপ, বংশ পরম্পরায় যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তারা কার্ড পাচ্ছেন না। অথচ বহুরূপী শিল্পের কিছুই জানে না তারা সহজেই পেয়ে যাচ্ছেন কার্ড। কারণ তাদের 'যোগাযোগ' ভালো। প্রবীণ আনন্দ চৌধুরী ব্যাধ বলেন, এই কারণেই ছেলে-মেয়েদের আর এই লাইনে আনব না বলেছে আমাদের ছেলেরা। পড়াশুনা যতদিন পারে করুক। অন্য জীবিকা খুঁজে নেবে।"

আনন্দের কথাতেই সায় দেয় সীতারাম, উত্তম, সঞ্জিত, অশোক বাবুরাও। তাদের অধিকাংশেরই অভিযোগ, ''সরকার বলেছিল মাসে এক হাজার টাকা ভাতা ও সঙ্গে চারটে করে অনুষ্ঠানের সুযোগ দেবে। তাতে মাসে হাজার পাঁচেক টাকা হয়ে যাবে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু কই!

এক সময় শুধু এই জেলা নয় রাজ্যের নানা প্রান্তে তো বটেই এমনকী ভিনরাজ্যে পরিবেশন করতে পেরেছি আমাদের শিল্পকে। আমাদের জীবন নিয়ে গবেষণা হয়েছে কিন্তু সেদিন আর নেই।" এই বলেই আনন্দ ব্যাধ গান ধরলেন— 'ওই সেনাপতি বিটকেল, করে দিল খিটকেল।'

কুলগ্রামের জন্য চিৎকার, জিয়াগঞ্জের জন্য চুপ কেন?

প্রতিটি মৃত্যুই দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। কাশ্মীরের কুলগ্রামে পাকিস্তানের কুখ্যাত জঙ্গিদের গুলিতে নিহত মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির পাঁচজন শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা। এই বর্বরোচিত ও কাপুরুষিত আক্রমণকে ধিক্কার জানাই। বিগতকালে পাকিস্তানি জঙ্গিদের গুলিতে কত জওয়ান, কত কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত, কত নিরীহ কাশ্মীরি মানুষ, কত ফৌজি অফিসার নিহত হয়েছেন তাঁর কোনো হিসেব নেই। তখন কংগ্রেসের সময়কাল এবং দীর্ঘ সত্তর বছরের আধিপত্য। আজ এত অল্প সময়ের মোদী সরকারের উপর চাপ কেন বিরোধীদের?

মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে একই পরিবারে চারজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। কোথায় নিরাপত্তা? বন্ধুপ্রকাশ পাল ও তাঁর পরিবার কিন্তু কাশ্মীরে যাননি, এই পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। কেন গণহত্যার শিকার হলেন তাঁরা? মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালির নিরাপত্তা দাবি করেছেন ভিন্ন রাজ্যে, অথচ নিজের রাজ্যে বাঙ্গালিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। আমরা কিন্তু কেউই ভুলে যাইনি জিয়াগঞ্জ ও দাড়িভিটের ঘটনা। এখনো জিয়াগঞ্জের কথা ভাবলে শরীরে কাঁটা দেয় এবং শিউরে উঠি। যেমন, ইসলামপুরের দাড়িভিটে পুলিশের গুলিতে নিহত দু'জন ছাত্রের দাবি কী ছিল? তাদের স্কুলে পঠনপাঠনের জন্য শিক্ষক দরকার। এই দাবির উপহারে মিলল পুলিশের গুলি। তাদের পাশে প্রথমে বিদ্যার্থী পরিষদ, পরে দিলীপ ঘোষ দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু আমরা কী দেখলাম সাগরদিঘির কাশ্মীরে জঙ্গি আক্রমণে মৃত পরিবারের পাশে পরিবহণমন্ত্রী তড়িঘড়ি গেলেন এবং পাঁচ লক্ষ টাকার চেক দিলেন। দাড়িভিটে কিন্তু এমন তড়িঘড়ি করে তাঁরা কেউ যাননি। অনেকদিন বাদে পরিবহণমন্ত্রীর জঘন্য রাজনীতি করতে গিয়ে ফিরে আসলেন। তারপর রয়েছে নির্বাচনের প্রাক্কাল থেকে ফলাফলের শেষের পরেও নিরপেক্ষ ভোটার থেকে রাজনৈতিক কর্মী ও ভোটকর্মীদের মুড়ি-মুড়কির মতো মৃত্যুর ঘটনা। মনে পড়ে, রায়গঞ্জের ভোটকর্মী শিক্ষককের নৃশংস খুনের ঘটনা! এরই প্রেক্ষিতে গত লোকসভা নির্বাচনে সমস্ত শিক্ষক জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের করণে তাঁদের সেন্ট্রাল নিরাপত্তার জন্য ধরনায় বসেছিলেন। রাজ্য সরকার এক মুহূর্তের জন্য বলেননি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তায় তাদের কোনো বাধা নেই, কিন্তু বাধা দিয়েছিল। বিগত দিনের পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির পাতা উল্টোলে উঠে আসবে একের পর এক হত্যালীলার ঘটনা। যা এখনও জ্বলজ্বল করছে। হতভাগ্য বঙ্গবাসী দেখল, এর জন্য সামান্যতম দুঃখপ্রকাশ শাসকদলের কেউই করলেন না। আজ কাশ্মীরের কুলগ্রামের ঘটনায় রাজ্য সরকার ও মন্ত্রীদের তৎপরতা দেখে বিস্মিত হলাম। পাশাপাশি কংগ্রেস ও বামপন্থীদের সোচ্চার হয়ে মোদীর বিরুদ্ধে গলা ফাটাতেও শুনলাম। বহু বছর ধরে প্রতিবেশী দু'দেশে হাজার হাজার হিন্দু পরিবারের উৎখাত, জঙ্গিদের হাতে প্রতিদিন নৃশংসভাবে খুন ও হিন্দু মা বোনেদের লাঞ্ছনা, হিন্দুদের জমিজমা ঘরবাড়ি সব দখল করে নেওয়া, মন্দির ভাঙা, প্রতিমা ভাঙা— এই বিষয়ে এদের কোনো উচ্চবাচ্য নেই। তারা একবারও বলেন না, কেন এভাবে সেদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গের সেকুলার রাজনৈতিক নেতারা বরাবরই হিন্দুদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করে থাকেন ভোটের স্বার্থে যা কখনোই কাম্য নয়। এদের সংখ্যালঘুদের প্রতি দরদ আর সংখ্যাগুরুদের প্রতি ঘৃণা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আক্রান্ত হলে কোনো হেলদোল নেই বাম কংগ্রেসিদের। এরা মিডিয়ায় শুধু গলাবাজি করেন। জিয়াগঞ্জ বাদেও রাজ্যের নানা প্রান্তে যেভাবে শত শত বাঙ্গালি অবাঙ্গালি রাজনৈতিক হিংসার বলি হচ্ছে তার জন্য এদের সক্রিয়তা কোথায়?

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

চিঠিপত্র

ইতিহাসের পুনর্লিখন প্রয়োজন

সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় দেখতে পেলাম কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পাঠ্যবই থেকে টিপু সুলতানের মহিমান্বিত অধ্যায়টি বাদ দিয়েছেন। প্রথমে এমন একটি প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানাই। ভোটের জন্য এমন একজন মহান নায়ককে উপরে তুলে একটি সম্প্রদায়কে তোল্লাই দেওয়া আদৌ কি প্রয়োজন আছে? এই টিপু সুলতানের বাবা ছিলেন হায়দার আলি। সে একজন বহিরাগত। সে নিজের নাম অনুসারে তার রাজধানীর নামে রাখে হায়দরাবাদ। যা আগে ছিল অমরাবতী। হায়দার আলি অনেক হিন্দুকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং অনেক মন্দির ধ্বংস করেন। তারই পুত্র টিপু সুলতান। এদের জয়গাথাকে লক্ষ্মীর পাঁচালি বানিয়ে আরও মহান করার কোনো প্রয়োজন নেই।

কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্য। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিহর ও বুক্ক। এদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দিল্লিতে ইসলামে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। সে কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল দিল্লির সম্রাট মহম্মদ বিন তুলঘলকের দ্বারা। পরে অবশ্য তারা ফিরে এসে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষে অনেক বংশের রাজা রাজত্ব করেছে। যেমন শক, হুন, মৌর্য, গুপ্ত। কিন্তু এরা কেউই ভারতীয় সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করেনি। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি জোরপূর্বক কোনো কিছু করেননি। যার জন্য তিনি আজও ভারতীয়দের কাছে পূজিত। টাকায় ও পতাকায় তাঁর কীর্তি স্বমহিমায় বিরাজ করছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা

ফঃ ৩

মুসলমানরা শুধু ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংসই করেনি, এদেশের মানুষদের নানা কায়দায় ইসলামে দীক্ষিত করেছে। মন্দির ধ্বংস থেকে শুরু করে নানাভাবে অত্যাচার করেছে। যেমন ঔরঙ্গজেব, তৈমুর লং, চেঙ্গিস খাঁ এদের কীর্তিকে না জানে? তবে এখানে একটি কথা অবশ্যই পাঠকবর্গকে স্মরণ করাবো। সুদিনের এবং স্মরণীয় ব্যক্তি ও তাদের কীর্তিকে অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় স্থান দেবার দরকার আছে। কিন্তু কুকীর্তি এবং দুর্ধর্ষ ঘটনাসমূহকে ইতিহাস বানিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারময় জগতে ঠেলে দেওয়ার আদৌ কি প্রয়োজন আছে? গৌরবের কথা মানুষের কাছে বলার যোগ্য, দুঃখের কথা মানুষকে শুনিয়ে ইতিহাস হয় না। কাজেই আমি মনে করি এই সমস্ত গোলামির ইতিহাস ছেঁটে ফেলে গর্বিত এবং মহিমান্বিত ইতিহাসকে পাঠ্যবইয়ে স্থান দিয়ে পুনর্লিখন হওয়া উচিত।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

সংখ্যালঘু না অ-মুসলমান?

বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানরা কী ধর্মীয় সংখ্যালঘু না অ-মুসলমান? কঠিন প্রশ্ন। উত্তর আরও কঠিন কেন এই প্রশ্ন? শুনলাম বাংলাদেশ সরকার 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন করার চিন্তা-ভাবনা করছে। শুরুতেই এরমধ্যে ঘাপলা লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'সংখ্যালঘু নয়, শব্দটি হোক, 'অ-মুসলমান'। অর্থাৎ 'অ-মুসলমান সুরক্ষা আইন'।

সংখ্যালঘু ও অ-মুসলমান শব্দ দু'টি সমার্থক নয়। একটি অপরটির পরিপূরকও নয়। সংখ্যালঘু শব্দটি উদার, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল। এর শাব্দিক বা অভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'সংখ্যায় কম'। পক্ষান্তরে অ-মুসলমান শব্দে সম্প্রদায়ের গন্ধ আছে, শব্দটি অনুদার ও প্রতিক্রিয়াশীল। এর অর্থ, যাঁরা মুসলমান নন'। এই শব্দের ধর্মীয় ব্যাখ্যা সুখকর নয়।

হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু। সীমান্ত পার হলে মায়ানমার বা ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। অর্থাৎ ধর্ম নির্বিশেষে যে কেউ সংখ্যালঘু হতে পারেন। আবার দেশে মহিলারা সংখ্যায় পুরুষেরা চেয়ে কম, তাই লিঙ্গভেদে তাঁরা 'সংখ্যালঘু'। মুক্তচিন্তা যারা করেন বা প্রগতিশীল বা নাস্তিকরা সংখ্যালঘু। ভালোমানুষের সংখ্যা কম, তাঁরা সংখ্যালঘু। চোর-বাটপার বেশি, তাই সৎ রাজনীতিকরা সংখ্যালঘু?

আমাদের আলোচ্য 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু'। অ-মুসলমান বললে কিছু মানুষকে 'বাক্সবন্দি' করে ফেলা হয়। অ-মুসলমান শব্দটি মুসলমান শব্দের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। প্রতিশব্দ ও প্রতিবন্ধী দুটি শব্দ একটি অপরটির মুখোমুখি। 'অ-মুসলমান', 'কাফির', এটি যারা ভাবেন, তাঁরা এতে সুযোগ পাবেন। মুসলমান দেশগুলোতে অ-মুসলমানদের অবস্থা দেখে বাংলাদেশে কেউ অ-মুসলমান হতে চাইবে না, এরচেয়ে সংখ্যালঘু ভালো।

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে পাহাড়িরা জনজাতি সম্মান হারিয়েছেন। 'দিনের ভোট রাতের অন্ধকারেই কি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা 'সংখ্যালঘু'র তকমা হারাবেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা 'অ-মুসলমান' হয়ে যাবেন। কেন একজন হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান অ-মুসলমান হবেন? তাহলে ভারতে কি হিন্দু বাদে সবাই 'অহিন্দু' হিসেবে পরিচিত হবেন?

ক'দিন আগে শাহারিয়ার কবির নিউইয়র্কে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এনিয়ে কথা হয়েছে। তিনি জানালেন, একটি মহল 'সংখ্যালঘু শব্দটি বাদ দিয়ে 'অ-মুসলমান' শব্দটি বসাতে চাইছেন। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এর তীব্র বিরোধিতা করছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ 'সংখ্যালঘু' শব্দটি রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। প্রগতিশীল শক্তির তাই করা উচিত। 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনটি' জরুরি ভিত্তিতে হওয়া দরকার, ভোলার ঘটনা তাই বলছে।

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

সেকুলাররাই বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশের কারণ

বাংলাদেশে হিন্দুরা নিয়মিতভাবে অত্যাচরিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, উৎপীড়িত হচ্ছে, হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি, শ্মশানঘাট এমনকী পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকেও প্রশাসনিক ক্ষমতায় উৎখাত করে জোর জবরদস্তি দখল করে নেওয়া হচ্ছে, হিন্দুমেয়েরা অপহৃত হচ্ছে, নিগৃহীত হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে, ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে। তবু এসব নিয়ে কারো কোনও মাথাব্যথা নেই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের যাদের অধিকাংশ পূর্বপুরুষই পূর্ব পাকিস্তানে/বাংলাদেশে মুসলমানদের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নিজেদের স্ত্রী কন্যা, ভগিনীদের মুসলমানদের দ্বারা অপহৃত হতে দেখে আর পরবর্তীকালে তাদের উদ্ধার করতে না পেরে রাতের অন্ধকারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় একবস্ত্রে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এই পশ্চিমবঙ্গে। পরবর্তীকালে সে সব কিছু বিস্মৃত হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করলেন— 'বাঙ্গলা ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' সেদিন বাঙ্গলা ভাগ না হলে তাঁরা কোথায় যেতেন, কোথায় আশ্রয় পেতেন তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হলেন। এদের বংশধর পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাই এখন আমোদ প্রমোদ বিলাস ব্যসন, দেশ ভ্রমণ নিয়ে ব্যস্ত। বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, হিন্দু মেয়েরা অপহৃত হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে তাতে তাদের কী করার থাকতে পারে? রাজনৈতিক নেতারা আছেন। তাঁরাই এসব দেখভাল করবেন। আমরা বরং বাংলাদেশের শিল্পীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করি। সেকুলারদের এই মনোভাবই হিন্দু বাঙ্গালিদের সর্বনাশের মূল কারণ।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর, হুগলী।

শৈশবকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব মা-বাবার

বি কে রোশনী

গত ১৫-২০ বছরের মধ্যে আমাদের সামাজিক চিত্রটা দারুণভাবে বদলে গেছে। সংসার ছোটো করার প্রতি যেমন আমরা মনোনিবেশ করেছি তেমনি পুরানো আমলের ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দিয়ে ফ্ল্যাটের চাবি ও বাইক না হলে গাড়ির হাত ধরে দ্রুততার সঙ্গে দিনগুলোকে পার করে দিচ্ছি। সংসারের প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই দৌড়তে হচ্ছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ততম জীবন। ভাবার সময় নেই সন্তান কীভাবে মানুষ হচ্ছে।

মা হলেন সন্তানের প্রথম আপনজন। তারপর বাবা। সে যখন দেখে বাবা-মা তাকে নিয়ে অশান্তি করছে, তখন সে বলতে পারে না— আমার একা একা এই জীবন ভালো লাগে না। ফলে অসহায়ত্বের অবস্থা থেকে অবসাদ চলে আসছে। খেতে চায় না, পড়তে চায় না, খেলতে চায় না, শুধু চুপচাপ মোবাইলকে আপন করে নিয়ে নানা শারীরিক সমস্যাকে ডেকে আনছে। এর জন্য দায়ী কে? বাবা-মা সন্তানকে দোষ দিয়ে বকাবকি করতে থাকেন, শিশুটি কাঁদতে থাকে। আশ্রয় চায় কিন্তু দেবে কে? তারপর ইমোশনাল হয়ে গিয়ে আদরে আদরে বা নানা গিফট নামক ঘুষ দিয়ে বাচ্চাকে ভোলাতে চেষ্টা করেন, যা পরবর্তী সময়ে বুমেরাং হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তখন মা-বাবা হতাশ হয়ে যান তার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে। না পারলে (বিশেষ করে কিশোর বয়সে) বাচ্চাটি সুইসাইড করার ভয়ও দেখাতে থাকে।

পড়ার চাপ, প্রত্যাশার চাপ, একাকিত্বের চাপ এবং মুড সুইংয়ের চাপ নিতে গিয়ে ভালো ভালো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নেশা ও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে অনৈতিক কাজ করে মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কে রক্ষা করবে এসব সরলমতি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের? বন্ধু দের সঙ্গে মোবাইলে কত কী দেখে, তারপর বিকৃত রুচির শিকার হয়ে অবসাদে ভুগতে থাকে। কোনও রোগ হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে চায় না যদি গোপন কথা সামনে চলে আসে।

রাত্রে ঘুম নেই, সকালে টয়লেটে যাওয়া হয় না। দেখা দেয় পেটের সমস্যা, মাথা ব্যথা, হিমোগ্লোবিন কমতে থাকে, পাইলস সহ নানা শারীরিক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সে বুড়িয়ে যাচ্ছে।

এভাবে শৈশব বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবারও কাউন্সেলিং দরকার, বলবে কে? কারণ সন্তানকে সঠিকভাবে মানুষ করতে গেলে নিজেদের মানসিক স্ট্যাবিলিটি দরকার। সহনশক্তি, ধৈর্যশক্তি ও মানিয়ে নেওয়ার শক্তি দরকার। কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি মানসিকভাবে দুর্বল হই তাহলে সন্তানদের শক্তি

দেবো কী করে? সবাই ডিপ্রেসড মুডে দিন কাটাচ্ছে। শরীরে নানা হরমোনের ব্যালান্সের অভাবে, মানসিক ও শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়তে হচ্ছে।

সমস্যার তো শেষ নেই। বেশি আলোচনা করার অবকাশ নেই। তার চেয়ে সচেতনতার কথা শেয়ার করা দরকার। শৈশব জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন, জীবনের ভিত্তি পাকাপোক্ত করার সময়। সেজন্য এই শৈশবকে যাতে সুরক্ষিত করা যায়, সুন্দর করা যায় তার লক্ষ্যে কিছু কথা, কিছু অভিজ্ঞতা।

(১) বাড়ির পরিবেশকে শান্ত রাখা দরকার। দাদু-দিদা বা দাদাই- ঠাম্মি মাঝে মাঝে এসে বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা দরকার। ওদের সঙ্গে মিশতে দিলে অনেক সমস্যা অনায়াসে সমাধান হয়ে যাবে। (২) কোনো কিছুর লোভ দেখিয়ে কোনো কিছু করানো, শেখানো বা অভ্যাসের পরিবর্তন করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে। (৩) কোনও কিছুই বেশি বেশি ভালো না। (৪) যা বাচ্চাদের শেখানো হবে, তা আগে নিজেরা পালন করা দরকার। যেমন--- নিয়মানুবর্তিতা, নিজের কাজ নিজে করা, রোজ টয়লেটে যাওয়া ইত্যাদি সঙ্গে মূল্যবোধ শেখানো দরকার। (৬) নেতিবাচক কথা যত কম বলা যায় ভালো। (৭) ফল খেতে উৎসাহিত করতে হবে। (৮) শারীরিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। (৯) একাকিত্ব যাতে না আসে তার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। (১০) ভ্রামরী, প্রাণায়াম, ওঁম্ ধ্বনি ও মেডিটেশন অবশ্যই অভ্যাস করানো দরকার। প্রয়োজনে নিজেরাও করবেন। (১১) অভিভাবকদের কোনও ধরনের নেশা করা ঠিক হবে না। বাচ্চাদের সামনে তর্কাতর্কি, মিথ্যা বলা, ঝগড়া করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা দরকার। (১২) শিশুমনে প্রভাব বিস্তার করে বা অবচেতন মনে স্টোর হয়ে যায় এমন কিছু ঘটনা যাতে না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (১৩) বাচ্চাদের বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মেশা দরকার, তাহলে অ্যাকটিভিটিস সম্বন্ধে জানা যাবে। (১৪) বাচ্চা একা থাকলে সি সি টিভির আন্ডারে থাকা দরকার। (১৫) নানা গেমস নিয়ে ওদের সঙ্গে নিজেকেও খেলা করতে হবে, উৎসাহ দেবার জন্য। (১৬) কম কথা ও মিষ্টি কথা বাচ্চারা পছন্দ করে, সেজন্য এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (১৭) ছোটোবেলা থেকে শেখানো দরকার ছেলে হোক বা মেয়ে ওদের গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়, মা ও বাবা বা দাদু-দিদিমা বা ঠাকুরমা-ঠাকুরদা ছাড়া। (১৮) গল্পের বই, গান ইত্যাদির প্রতি নেশা জাগাতে পারলে খুব ভালো ফল দেবে। (১৯) সন্তান গর্ভে আসার আগে থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। (২০) সব হয়তো সব সময় পালন করা সম্ভব হয় না, কিন্তু বেসিক জিনিসগুলোর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, নাহলে অনেক ক্ষতির শিকার হতে হয়। (২১) স্কুলে যদি পড়াশোনা করে তাহলে মাঝে মাঝে ক্লাস টিচারের কাছে খোঁজ নেওয়া দরকার। কোনও অনিয়ম বা মানসিক সমস্যা অনুভব হলে স্কুলে কাউন্সিলার থাকেন, তার কাছে রেফার করা হয়। সেক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শও নেওয়া যেতে পারে।

শিশুদের সুরক্ষা, সুঅভ্যাসে অভ্যস্ত করা, সুপথে পরিচালিত করা এবং সুস্থ জীবন যাপন করতে সাহায্য করার জন্য মা-বাবা দায়বদ্ধ। শুধু কিছু আইন বা বিজ্ঞাপন দিয়ে তা করা সম্ভব নয়। তার জন্য সতর্ক ও সচেতন থাকা দরকার।

(সৌজন্য : দৈনিক সংবাদ)

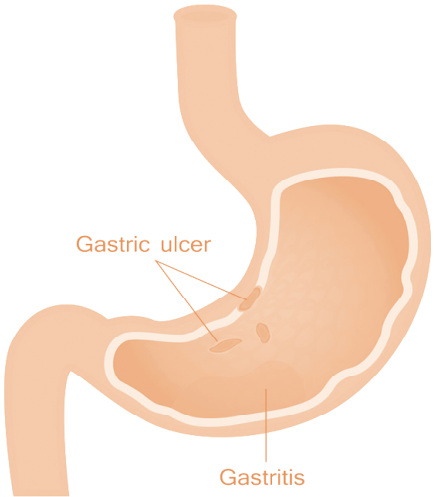

পেটের অসুখে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

ডাঃ সমরজিৎ ঘটক

গ্যাসট্রো ইনটেসটিনাল বা খাদ্যনালীর অসুখগুলিকে খাদ্যনালির গঠন অনুযায়ী অর্থাৎ মুখগহ্বর থেকে পায়ুদ্বার পর্যন্ত আপার থেকে লোয়ার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন— GERD, Gastritis, Peptic Ulcer, Colitis, Piles ইত্যাদি।

আমাদের রাজ্যে বহু প্রচলিত একটি অসুখ হলো চলতি কথায় গ্যাস বা অম্বল। এই গ্যাস অম্বল হলো উপসর্গ। এর পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। শরীরের যন্ত্রপাতির যে সমস্যা থেকে এই গ্যাস অম্বলের উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক—

১. রিফ্লাক্স ইসোফেজাইটিস : আয়ুর্বেদে বলে 'উদাবরত ও গুল্ম'। খাদ্যনালির উপরের অংশ যা মুখের খাবার পাকস্থলীতে নিয়ে যায় তাকে ইসোফেগাস বলে। এই ইসোফেগাসের মধ্যে জলের পাইপের ভাল্‌ভের মতো বা রিংয়ের মতো sphincter থাকে। এর কাজ হলো পাকস্থলীর মধ্যে থাকা অ্যাসিড মিশ্রিত খাবারকে উপরে উঠতে না দেওয়া। এই রিংয়ের মতো sphincter যদি ঢিলে হয়ে যায় তবে খাবার উপরে উঠে আসবে, বুক জ্বালা করবে, বমি বমি ভাব থাকবে। আপার জি আই অ্যাডোস্কপি দ্বারা রোগ নিশ্চিত করা যায়। চিকিৎসা— ডাক্তারের পরামর্শ মতো খাবার খাওয়া, রাত না জাগা, পরিমিত ঘুম, টেনশন মুক্ত থাকা, ব্যায়াম করা। ওষুধের মধ্যে শঙ্খ ভস্ম, গুড়ুচ্যাদি, ম্রিদ্বিকাদি বর্গের ভেষজ, ধাত্রি, অমৃতা, মধুকা, কটকী ইত্যাদির নির্যাস, বিল্বাদি লেহ ভীষণ কার্যকরী। ওষুধের মাত্রা ও চিকিৎসার সময়সীমা রোগের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

২. গ্যাসস্ট্রাইটিস : পাকস্থলীর প্রদাহ। পাকস্থলীতে অ্যাসিডের উপস্থিতিতে খাবার হজম হয়। এই অ্যাসিড পাকস্থলীর দেওয়ালকে ক্ষতি করতে পারে না, কারণ সেখানে মিউকাসের একটি আস্তরণ বা চাদর থাকে। এইচ পাইলোরি ইনফেকশন, মদ্যপান, ধূমপান, ব্যথার ওষুধ বেশিদিন ব্যবহার করা, অত্যধিক চা কফি পান, মানসিক অবসাদ বা অন্য কোনও কারণে এই আস্তরণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অ্যাসিড পাকস্থলীর দেওয়ালের ক্ষতি করে। পেট ভার, অরুচি, উপরের পেটে ব্যথা, বদহজম এসব লক্ষণ দেখা দেয়।

৩. পেপটিক আলসার : গ্যাসস্ট্রাইটিস যে কারণে হয় সেই একই কারণে পাকস্থলী বা তার পরের অংশ ডুওডিনামে ক্ষত সৃষ্টি হয়। খালিপেটে বা খাবার পরেই পেটে ব্যাথা, বমি, বদহজম, দুর্বলতা এসব লক্ষণ দেখা দেয়।

গ্যাস্ট্রাইটিস ও পেপটিক আলসার : রোগ দুটিকে আয়ুর্বেদ অম্লপিত্ত বা বিদগ্ধা অজীর্ণ বলে। সমান বায়ু ও পিত্তের বিকার থেকে এগুলি হয়। অ্যাডোস্কপি দ্বারা রোগ নিশ্চিত করা যায় ।চিকিৎসা— ওষুধ ও পঞ্চকর্ম দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। ফলত্রিকাদি, মানিভদ্র, ধাত্রি লৌহ, শঙ্খভস্ম, গুড়ুচ্যাদি, ম্রিদ্বিকাদি, দ্রাক্ষাদি বর্গের ভেষজ, ধাত্রি, অমৃতা, মধুকা, কটকী এসব শাস্ত্রীয় ও অনেক পেটেন্ট কার্যকরী ওষুধ আছে।

তাই গ্যাস অম্বল বেশ কয়েকদিন থাকলে এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করাতে ইচ্ছুক হলে অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। মুড়ি-মুড়কির মতো অম্বলের ওষুধ বা বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ খাওয়া মোটেও নিরাপদ নয়, টোটকা তো একেবারেই নয়। চিকিৎসার সাফল্য ও সময়সীমা রোগ ও রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। ম্যাজিক বা গ্যারান্টি বলে কিছু হয় না। অনেকেই গ্যাস অম্বল হলে সোডা ওয়াটার খেয়ে নেন। সোডা ওয়াটার অ্যাসিডকে প্রশমিত করে সাময়িক আরাম দেয় বটে, কিন্তু সোডা ওয়াটার ও অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় যা পাকস্থলীর দেওয়াল প্রসারণ করে যা পরে আরও বেশি করে অ্যাসিড ক্ষরণ ঘটায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খাঁটি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুধু মাত্র প্রাইভেট ক্লিনিক বা রাজধানী শহর কলকাতাতেই নয়, গ্রামবাঙ্গলাতেও পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের ২০০ গ্রামীণ সদর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল অফিসারদের দিয়ে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। ■

বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ডের চাবি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল

সাধন কুমার পাল

২০১৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে এন আর সি নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরই বিভিন্ন সময়ে জলপাইগুড়ি, মালদা, গাজল শহরেও অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এই পাঁচটি সভাকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ ও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই প্রতিবেদক ও রন্তিদেব সেনগুপ্ত বক্তা হিসেবে এই পাঁচটি সভাতেই উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকটি আলোচনা সভার শেষে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। সেই প্রশ্নোত্তর পর্ব যেন এখনো শেষ হয়নি, প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন নাগরিক কার্যক্রমে তো বটেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল (সিএবি) এবং এন আর সি নিয়ে উদ্বিগ্ন মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত মানুষের কাছ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন আসছে সেগুলি থেকে বাছাই করা কিছু প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নোত্তরে সিএবি তুলে ধরার প্রয়াস করা হলো।

কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৬ এবং এনআরসি চালুর কথা বলে দেশ জুড়ে একটি অস্থিরতা তৈরি করল না? বিশেষ করে দেশভাগের পর ভারতে এসে বছরের পর বছর ধরে নিশ্চিন্তে বসবাসকারী হিন্দুদের নতুন করে উদ্বাস্তুর তকমা দিয়ে বিপদে ফেলে দিল না?

উত্তর : দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এই দেশে এসেছে, রেশন কার্ড বানিয়েছে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে, জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিতও হয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজন মতো স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হচ্ছে, চাকুরি, ব্যবসা বা অন্য কোনো পেশা অবলম্বন করে আর দশটা ভারতীয় নাগরিকের মতো সমস্ত নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। অপ্রিয় হলেও এটাই সত্য যে এই সমস্ত মানুষের অধিকাংশই দেশভাগের পর থেকে বছরের পর বছর ধরে ভারতে বসবাস করে সমস্ত রকম নাগরিক অধিকার ভোগ করলেও এদেশের নাগরিকত্ব আইনের কষ্টিপাথরে নিজেদের নাগরিকত্বের বৈধতা যাচাই করেনি। জমির দলিল, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, পাশপোর্ট কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো নথিগুলি যে কোনো ব্যক্তির ভারতের নাগরিকত্বের গ্যারান্টি দেয় না এই বিষয়টি এখন অনেকের কাছেই স্পষ্ট। ভারতে নাগরিকত্ব আইন আছে, কিন্তু সেই আইন অনুসারে নাগরিকপঞ্জি নেই। ফলে বিভ্রান্তি চরমে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কে এদেশের নাগরিক, আর কে নাগরিক নয় এটা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। অসমের অভিজ্ঞতা বলছে শিক্ষা, সচেতনার অভাব কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত কারণের জন্য এদেশের অনেক প্রকৃত নাগরিকের নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রয়োজনীয় নথি নেই। ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশের জন্মের সময় সুনামির ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছিল ভারতমুখী উদ্বাস্তুর স্রোত এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে ইসলামিক জেহাদের সৌজন্যে সেই স্রোতধারা এখনো গতিশীল। বিশাল সংখ্যক উদ্বাস্তুর বোঝা নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার সাত দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর নাগরিকত্বের প্রশ্ন নিয়ে কোনো নীতি নির্ধারণ হয়নি। ফলে অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরি করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ও প্রকৃত নাগরিকের নাম নথিভুক্ত হয়নি। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনে উদ্বাস্তুদের বিশেষ করে বাঙ্গালি হিন্দুদের

নাগরিকত্ব প্রদানের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যা সমূলে উৎপাটন করতে উদ্যোগী হয়েছে। নাগরিকত্ব নিয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ দুটোই কঠিন ও জটিল কাজ। এই জটিল কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত জটিলতা তৈরি হয়েছে তা সাময়িক।

এই বিলে মুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদানের উল্লেখ নেই কেন? ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এ রকম একটি সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনা আইনে পরিণত হয় কী করে?

উত্তর : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কখনই সাম্প্রদায়িক নয়। কারণ এই সংশোধনীর ফলে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে না। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু যারা অত্যাচারিত হয়ে বা অত্যাচারের ভয়ে ভারতে চলে এসেছেন তাদের প্রত্যেকের জন্যই এই আইন প্রযোজ্য। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যেখানে সেদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা অত্যাচারিত হয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন বা আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। তবে আশ্রয় প্রার্থনা করলে যে সম্মানের সঙ্গে আশ্রয় দেওয়া হয় তার প্রমাণ তসলিমা নাসরিন। সেজন্য ওই দেশগুলি থেকে গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেওয়া মুসলমানদের ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কোনো রকম বিশেষ ছাড়ের যৌক্তিকতা নেই।

আপনি পশ্চিমবঙ্গকে যতই বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড বলুন না কেন ভারতীয় সংবিধানের ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সেকশান ৩ (২) (খ) অনুযায়ী এরা সবাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। ১৯৪৬ ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং ১৯২০ পাসপোর্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী এদের গ্রেপ্তার করা যায়।

উত্তর : আপনি একদম ঠিক বলেছেন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ওঁরা সবাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলেই গণ্য হতেন। ২০১৫ সালে এই দুটি আইনের সংশোধন করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ও পার্সিদের এই দুটি আইনের আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নন। ওদের লং টার্ম ভিসার পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে ভারতে চাকরি, বসবাস ও সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

মানবতার প্রশ্নই যদি আসে তাহলে ভারত মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিচ্ছে না কেন?

উত্তর : রোহিঙ্গা মুসলিমদের হাতে লেগে রয়েছে রোহিঙ্গা হিন্দুদের, বৌদ্ধদের গণহত্যার রক্ত। রোহিঙ্গা মুসলমানরা রোহিঙ্গা হিন্দুদের গণহত্যার জন্য দায়ী এটা অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশানালও মেনে নিয়েছে। একমাত্র অত্যাচারিতরাই শরণার্থীর সম্মান পেতে পারে, খুনি অত্যাচারীরা নয়।

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬ অর্থাৎ সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৬ আসলে কী?

উত্তর : নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর সেকশান (২) এর সাব সেকশান (১), ক্লজ (b) এর পরে এই সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি অথবা খ্রিস্টান হন যারা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বিশেষ ছাড় প্রাপ্ত, যিনি ১৯২০ সালের পাসপোর্ট (Entry into India) আইনের সেকশান (৩) এর সাব-সেকশান (২) এর ক্লজ (c) অথবা বিদেশি আইন, ১৯৪৬ ধারা সমূহ কিংবা অন্য কোনো আদেশনামার আওতার অন্তর্গত হন, এই আইনানুসারে তাকে কোনো ক্ষেত্রেই অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি অথবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা এতকাল বৈধ কাগজ পত্র ছাড়া ভারতে প্রবেশ করলে অথবা বৈধ কাগজ পত্র নিয়ে প্রবেশ করার পর সেই কাগজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য হতেন এবং এদেশের নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন না। বর্তমান সংশোধনের মাধ্যমে উপরে উল্লেখিত তিনটি দেশের পাঁচটি সম্প্রদায়ের মানুষ যে ভাবেই প্রবেশ করুন না কেন তারা আর অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গণ্য হবেন না এবং নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ তিনি একজন ভারতীয় নাগরিকের সমান মর্যাদা পাবেন।

আরও বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত হন বা বিচারাধীন হন তাহলে এই আইন পাশ হওয়ার পরে তার বিরুদ্ধে সমস্ত আইনি কার্যকলাপ এই বিল পাশের সময় থেকে বন্ধ করতে হবে এবং সেই ব্যক্তি নাগরিকত্বের জন্য সেকশান (৬) এর আওতায় আবেদন করতে পারবেন। স্পষ্টতই অসমের ডিটেনশান ক্যাম্পে

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের যে সমস্ত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি অথবা খ্রিস্টান বন্দি আছেন ওরা সবাই মুক্তি পাবেন। এছাড়া অন্যদের মুক্তির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে।

অনেকের মতে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬ বেআইনি অর্থাৎ সংবিধান সম্মত নয়। এই বক্তব্য কতটা সত্য?

উত্তর : এই ধরনের বক্তব্য ঠিক নয়। ১৯২০ সালের পাসপোর্ট আইনের সেকশান (৩) এর ভিত্তিতে ভারত সরকার ১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনী আনতে পারে অর্থাৎ এর দ্বারা বর্তমান আইনের কোনো বিশেষ ধারার বশবর্তী না হয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহকে শর্তাধীন বা নিঃশর্ত ছাড় দিতে পারে।

নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর সেকশান (৬) তে কীভাবে নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র সেকশান (৬) হলো সিটিজেনশিপ বাই ন্যাচারালাইজেশান অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারেন যদি তিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না হন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬-এর চার নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে—

In the principal Act, in the Third Schedule, in clause (d), the following provison shall be inserted, namely : "Provided that for the persons belonging to minority communities, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangaladesh and Pakistan, the aggregate period of residence or service of a Government in India as required under this clause shall be read as 'not less than six years' in place of 'not less than eleven years."

অর্থাৎ মূল নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর তৃতীয় পর্যায়ে, ক্লজ (D) অনুযায়ী শুধুমাত্র উপোরক্ত তিনটি দেশের পাঁচটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য উল্লিখিত সময়সীমা ১১ বছর থেকে কমিয়ে ছয় বছর করা হয়েছে।

অনেকেই বলছেন এই বিল সংবিধানের ধারা (১৪)-কে লঙ্ঘন করছে।

উত্তর : এই বিল কোনো ভাবেই সংবিধানের ধারা (১৪)-কে লঙ্ঘন করেনি। এই ধারায় আইনের ক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকার এবং সকলকে সমানভাবে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে সংবিধান সভার প্রথম ভাষণে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill fortune alike.' এই সূত্র অনুসারে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে অত্যাচারিত প্রত্যেকটি সংখ্যালঘুকে নিরাপত্তা প্রদান করা ভারতের

স্বাধীন ভারতে কীভাবে নাগরিকত্বের বৈধতা নির্ণয় হয় এবং নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য কী কী আইন আছে?

উত্তর : ভারতে নাগরিকত্বের বৈধতা নির্ণয় ও নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য সাধারণত তিনটি আইনের সাহায্য নেওয়া হয়।

(১) ১৯২০ সালের পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশাধিকার) আইন।

(২) ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্ট বা বিদেশি ব্যক্তি আইন।

(৩) ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন।

১৯২০ সালের পাসপোর্ট আইন অনুসারে যে কোনো ব্যক্তি বৈধ ভিসা এবং পাসপোর্ট ছাড়া ভারতবর্ষে জল, স্থল বা আকাশ পথে প্রবেশ করলে তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য করা হবে এবং এই আইন মোতাবেক তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তার এক থেকে পাঁচ বছরের জেল সেই সঙ্গে দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে।

১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হন অথবা তিনি যদি বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে থাকেন তাহলে তার বিচার হবে।

কর্তব্য। ভারতবর্ষে শরণার্থী আইন থাকলে এই শরণার্থীদের সেই আইনে সহায়তা দেওয়া যেত। কিন্তু সেরকম আইন যেহেতু নেই সেজন্য নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনী এনেই সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

নাগরিকত্বের আবেদনের ক্ষেত্রে ছয় বছর বসবাসের প্রমাণ হিসেবে কী ধরনের নথি প্রয়োজন? যারা চাকরি করছেন তাদের কী হবে?

উত্তর : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, এখনো আইনে পরিণত হয়নি। বিলটি আইনে পরিণত হলে কোন কোন নথির ভিত্তিতে নাগরিকত্বের আবেদন গ্রহণ করা হবে তা স্পষ্ট হবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬-এর চার নম্বর ধারায় ছয় বছর বসবাসের প্রমাণ হিসেবে কেবল মাত্র বসবাসের প্রমাণ চাওয়া হয়নি। বসবাস বা চাকুরিক্ষেত্র কিংবা কর্মক্ষেত্রের যে কোনো একটির প্রমাণ দিলেই হবে। অর্থাৎ বর্তমানে তারা যদি চাকরিরত থাকেন তাকেও বসবাসের প্রমাণ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং তাদের জীবিকা হারানোর বা সম্পত্তি হারানোর কোনো ভয় থাকছে না।

প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ কি নতুন কোনও আইন?

উত্তর : বর্তমানে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ প্রস্তাবিত হয়েছে তা প্রথম নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৬ নামে লোকসভায় পেশ হয়। ২০১৬ সালের ১৯ জুলাই এটি সংসদে পেশ হয়। তারপর রাজ্যসভায় বিরোধিতার জেরে ১২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এই বিলটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে পাঠানো হয়। ৭ জানুয়ারি, ২০১৯ সংসদীয় কমিটি তাদের রিপোর্ট দেয়। জানুয়ারি ৮ তারিখে এই বিল লোকসভায় পাশ হয় কিন্তু এই বিলটি আবার রাজ্যসভায় আটকে যায়।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু হিন্দুদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব না দিয়ে, নানা শর্ত চাপাচ্ছে কেন?

উত্তর : নাগরিকত্ব হচ্ছে একটি আইন সম্মত স্বীকৃতি। যে কোনো আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি অথবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের ভারতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কোনো রকম কাগজপত্র ছাড়াই নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য যোগ্য বলে ঘোষণা করার বিষয়টিকে যদি নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদান বলা না হয় তবে কাকে নিঃশর্ত বলা হবে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে প্রমাণ করবে যা তারা অত্যাচারিত হয়েছে?

উত্তর : এই বিষয়টি নিয়ে আমি সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের একাধিক আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অত্যাচারিত হয়ে আসার বিষয়টি একটি লিগ্যাল প্রিজামশন হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত তিনটি দেশের সংখ্যালঘুরা ভারতে আশ্রয় নিলে এটা ধরে নেওয়া হবে যে অত্যাচারিত হওয়ার জন্যই এই মানুষেরা ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতে এসেছে। এক্ষেত্রে কোনোরকম সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে না।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬-তে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নাগরিকত্বের আবেদনের ক্ষেত্রে ছয় বছর অপেক্ষা করার শর্ত রাখা হয়েছে কেন?

উত্তর : এই সময়সীমার ব্যাপারটি নতুন কোনো বিষয় নয়। নেচারালাইজেশন পদ্ধতিতে নাগরিকত্বের আবেদন করার জন্য নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-তে উল্লেখতি ১১ বছরের সময়সীমা শুধুমাত্র বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কমিয়ে ছয় বছর করা হয়েছে। যারা এই সময়সীমা রাখার মধ্যে বাঙ্গালি বিদ্বেষের গন্ধ পাচ্ছেন তাদের কিন্তু বছরের পর বছর ধরে নাগরিকত্ব আইনে উল্লেখিত ১১ বছরের সময়সীমা নিয়ে কখনোই মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ এন আর সি-র কাজ শুরু হলে তাতে নাম তুলতে গেলেও কি ১৯৭১ সালের আগের কাগজ প্রয়োজন হবে?

উত্তর : ১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত অসম চুক্তিতে ১৯৭১ সাল-কে ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছিল। সেই অসম চুক্তিকে ভিত্তি করেই ওই রাজ্যে এন আর সি হয়েছে। অবশিষ্ট ভারতে অসম চুক্তির মতো কোনো বাড়তি জটিলতা নেই। এই কারণের জন্য সমস্ত দেশের জন্য প্রস্তাবিত এন আর সি ভিন্ন প্রকৃতির হবে এটাই স্বাভাবিক। ভিত্তিবর্ষ যাই হোক না কেন প্রকৃত ভারতীয় এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আগত পাঁচটি সম্প্রদায়ের মানুষের চিন্তার কোনো কারণ নেই। কারণ ২০১৫ সালে আইন পাশ করে ১৯২০ সালের পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশাধিকার) আইন ও ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্টে সংশোধন করে এটা নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে যে ১৯১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে উপরে উল্লেখিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা ভারতে প্রবেশ করবে তারা কোনো ভাবেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নন। সেই সঙ্গে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থাও হচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে অসমে ১১ লক্ষেরও বেশি হিন্দুর নাম এন আর সি-র বাইরে থেকে গেল কেন? তাদের ভবিষ্যৎ কী?

উত্তর : সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আইনে পরিণত হলে এই সমস্যা সম্পূর্ণ রূপে সমাধান হবে। উপযুক্ত নথি থাকা সত্ত্বেও যাদের নাম এন আর সি-তে ওঠেনি অসম সরকার তাদের সমস্ত রকম আইনি সহায়তা দিচ্ছে যাতে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। তাছাড়া দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অসম সরকার এই আশ্বাস দিয়েছেন একজন হিন্দুকেও যাতে ভারতের বাইরে যেতে না হয় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অসমের এন আর সি তৈরির প্রক্রিয়াতে কি কোনো ত্রুটি ছিল যে কোনো পক্ষই এতে খুশি হতে পারেনি?

উত্তর : ত্রুটি তো অবশ্যই ছিল। মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ বলছে সেই সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করে এন আর সি-র পুরো প্রক্রিয়াটি আবার পর্যালোচনার কথা নাকি ভাবা হচ্ছে।

মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ বলছে পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি-র আতঙ্কে মানুষ মারা যাচ্ছে এটা কি সত্যি?

উত্তর : এই সমস্ত সংবাদের কোনো ভিত্তি নেই। যাদের মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে তাদের অধিকাংশকেই রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আর্থিক সাহায্য করেছে। ফলে অভিযোগ উঠছে অন্য কারণে মৃত্যু হলেও আর্থিক সাহায্যের প্রলোভন দিয়ে এই সমস্ত পরিবারকে দিয়ে এন আর সি-র আতঙ্কে মৃত্যুর কথা বলানো হচ্ছে।

ভোটার কার্ড ভেরিফিকেশন, ডিজিটাল রেশন কার্ডের আবেদন জমা, ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্তিকরণ ইত্যাদি কাজগুলির সঙ্গে কি এন আর সি-র কোনো সম্পর্ক আছে?

উত্তর : এই সমস্ত ব্যাপার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এগুলির সঙ্গে এন আর সি-র সম্পর্ক নেই।

ডি ভোটার কী? এর সঙ্গে কি এন আর সি-র কোনো সম্পর্ক আছে?

উত্তর : ১৯৯৭ সালের ১৭ জুলাই ভারতের নির্বাচন কমিশন অসম সরকারকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নাগরিকত্বহীন ব্যক্তিদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ পাওয়ার পর অসম সরকারের তরফ থেকে বাড়ি বাড়ি সার্ভের মাধ্যমে যাচাই করে ভোটার তালিকা নবীকরণের কাজ শুরু হয়। এই সার্ভের সময় যারা সঠিক নথিপত্র দেখাতে পারেননি অথবা যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের নামের পাশে D (Doubtful) চিহ্নিত করে রাখা হয়।

ডিটেনশন ক্যাম্প কী? অসমে এন আর সি ছুটদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার অনেক ঘটনা শোনা যাচ্ছে এই সমস্ত ঘটনা কতটা সত্য?

উত্তর : নির্বাচন কমিশন ডি-চিহ্নিত ব্যক্তিদের নিয়ে ফরেনার (ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৬৪ অনুসারে গঠিত ফরেনার ট্রাইব্যুনাল ট্রায়াল চালানোর নির্দেশ দেয়। এর মধ্যে ট্রায়ালে অনুপস্থিত D-চিহ্নিত বেশ কিছু বাংলাদেশি পলাতক বলে ঘোষিত হয়। এই পরিস্থিতিতে ৪ এপ্রিল ২০০৪ গৌহাটি হাইকোর্ট ট্রায়াল শেষ না হওয়া পর্যন্ত D-ভোটারদের গোয়ালপাড়া ও কোকরাঝাড় ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়। মিডিয়া রিপোর্ট বলছে বর্তমানে এক হাজার জনের মতে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি আছে। CAB আইনে পরিণত হলে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি উপরে উল্লেখিত তিনটি দেশ থেকে আগত পাঁচটি সম্প্রদায়ের মানুষ শুধু মুক্তি পাবেন এমন নয় ভবিষ্যতে আর কেউ বন্দি হবেন না।

অসমে এনআরসি-তে নাম না ওঠার জন্য এখনো পর্যন্ত নতুন করে একজনকেও ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়নি। ভবিষ্যতে আদালতের রায়ে যারা অনুপ্রবেশকারী (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আগত মুসলমান) হিসেবে চিহ্নিত হবেন তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হবে এমনটাই জানা গেছে। ডিটেনশান ক্যাম্প নিয়ে কিছু মিডিয়া টিআরপি বাড়ানোর জন্য অনাবশ্যক আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন প্রয়োজন কেন?

উত্তর : অতীতে অনেক বার নাগরিকত্ব আইন সংশোধন হয়েছে। বর্তমানে অর্থাৎ ২০১৬ সাল থেকে এই আইনে যে সংশোধনের কথা বলা হচ্ছে তা আসলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি অথবা খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা বললেও আসলে বাঙ্গালি হিন্দুদের কথা ভেবেই কি এই বিল আনা হচ্ছে না?

উত্তর : বাঙ্গালি হিন্দুদের কথা ভেবেও যদি এই বিল আনা হয়ে থাকে তাহলে দোষের কী? পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড। এই কথার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতা নেই। কারণ বাংলাভাষী মুসলমানরা তাদের নিজস্ব হোমল্যান্ড হিসেবে বাঙ্গলার দুই তৃতীয়াংশ জমি সেই ১৯৪৭ সালেই বুঝে নিয়েছে। বাঙ্গালি হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে এলে তাদের দু' হাত তুলে বরণ করে নেওয়া হবে— এটাই স্বাভাবিক।

হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচতে হলে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন একান্ত প্রয়োজন

মোহিত রায়

প্রথমে বাঙ্গালির সংজ্ঞা ঠিক করে নেওয়া যাক। কারণ কে বাঙ্গালি তা ঠিক না করে নিলে নিজেদের বাঙ্গালি বলে দাবি করে ও জনসংখ্যার জোরে তারাই বাঙ্গালি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। এটা কোনো দূর ভবিষ্যতের ভয় দেখানোর গল্প নয়, এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালি অনেকটাই এক হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা বাঙ্গালি বলতে বাংলাদেশের জনসাধারণকেও বোঝাই। একটাই কারণ সবার মাতৃভাষা বাংলা। বামপন্থী সেকুলারদের দাপটে আমরা বলতে ভুলে গেছি যে ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বঙ্গপ্রদেশকে ভাগ করতে হয়েছে হিন্দু ও মুসলমানের দেশে। আর তারপর ৭০ বছর ধরে মুসলমানের দেশ পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে মেরেধরে, জমি কেড়ে, মেয়েদের উপর অত্যাচার চালিয়ে, মন্দির ভেঙে হিন্দু তাড়ানো চলছেই। সুতরাং আমাদের পরিষ্কার করে সব ক্ষেত্রে বলতে হবে বাঙ্গালি মনে হিন্দু বাঙ্গালি, যে বাঙ্গালির অস্তিত্ব মুসলমান বাংলাভাষীরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এটা যে স্রেফ কোনো সাম্প্রদায়িক দোষারোপ নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ গত ৭০ বছরে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে বাঙ্গালি হিন্দু জনসংখ্যা ২৮ শতাংশ থেকে কমে ৮ শতাংশ হয়ে যাওয়া। কিন্তু বাঙ্গালি হিন্দুর নিজের ভূমি পশ্চিমবঙ্গে যখন গত ৭০ বছরে হিন্দুর সংখ্যা ৮০ শতাংশ থেকে কমে ৬৯ শতাংশ হয়ে যায় তখন কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে— তা হলো নাগরিকত্ব সংশোধন আইন এবং তার পরে এন আর সি বা নাগরিকপঞ্জী নবীকরণ।

বাংলাদেশ হবার পর ১৯৭২ থেকে যে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকলেন আগের মতো তাঁদের জন্য কোনো আইনি রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সেই উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাননি। যদিও প্রায় সবার কাছেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থাকলেও সেগুলি দিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করা যায় না। গত কয়েক দশক ধরে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি নাগরিকত্বের দাবি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে বারবার করে এসেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রধান রাজনৈতিক দল

বিলটিতে বলা হয়েছে যে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের যাঁদের পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ ও বিদেশি আইন ১৯৪৬-এ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাঁদের আর অবৈধ অভিবাসী বলে গণ্য করা হবে না। সংখ্যালঘু বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ও পারসিদের উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক হবার জন্য যোগ্য হলেন।

সিপিআইএম, তৃণমূল ও কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের এই স্বীকৃতির জন্য কোনো প্রচেষ্টা নেয়নি। গত ৪৫ বছর ধরে কেন্দ্রে মূলত রাজত্ব করেছে কংগ্রেস দল। তারা এই বিষয়টি নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯ জুলাই ২০১৬-তে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬, পেশ করেন। এই সংক্ষিপ্ত বিলটিতে বলা হয়েছে যে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের যাঁদের পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ ও বিদেশি আইন ১৯৪৬-এ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাঁদের আর অবৈধ অভিবাসী বলে গণ্য করা হবে না। সংখ্যালঘু বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ও পারসিদের উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক হবার জন্য যোগ্য হলেন। বিলটি পেশ হবার পর কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিআইএমের আপত্তির জন্য বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়। বিলটি সামান্য সংশোধন করে আবার লোকসভায় পেশ করা হয় ও ৮

জানুয়ারি ২০১৯-এ লোকসভায় তার পাশ হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনিশ্চয়তায় বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয়নি। যেহেতু এরপর লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, ফলে এবার বিলটি আবার নব নির্বাচিত লোকসভায় ও রাজ্যসভায় পেশ করা হবে। এই আইনটি পাশ হয়ে গেল হিন্দু উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এই অধিকার পাবে না। বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়নের কোনো আইনি জটিলতা থাকবে না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে বেআইনি ভাবে এসে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। ১৯৫১-র ১৯ শতাংশ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই(এম) ও তৃণমূল কংগ্রেস নীরব থাকে, কারণ অনুপ্রবেশকারীরা এই দলগুলির শক্তি। উদ্বাস্তু বিষয়ে বললে বাংলাদেশের ইসলামি অত্যাচার প্রকাশিত হয়ে যায় যা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা কেউ চায় না। বাংলাদেশ গঠনের পর বিশেষত বামফ্রন্ট সরকার আসার পর দলে দলে বাংলাদেশি মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে থাকে। ৬ মে, ১৯৯০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় বলেছিলেন যে, ভারতে ১ কোটি বাংলাদেশি আছে। ১১ অক্টোবর ১৯৯২-এর গণশক্তি পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লিখলেন, ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিএসএফ ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫২৯ জন বাংলাদেশিকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৮৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এরপর ১৪ জুলাই ২০০৪ সালে কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ জয়সোয়াল লোকসভায় জানালেন যে ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বাংলাদেশি রয়েছে। অবশেষে ২০০৫-এ লোকসভাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা ও সিপিএম তাদের দিয়ে ভোট করানোর অভিযোগ তুলে স্পিকারকে কাগজপত্র ছুঁড়ে হৈচৈ বাঁধালেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ যে ভয়ানক সমস্যা তা জ্যোতি বসু থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই জানেন। জ্যোতি বসুরা বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে মূলত ভোটের খেলা খেলছিলেন ক্ষমতায় থাকার জন্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করবার ইসলামি পরিকল্পনায় মদত দিচ্ছেন।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন আগামী লোকভায় পাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর এনআরসি বা নাগরিকপঞ্জী নবীকরণ শুরু হলে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানরা চিহ্নিত হবেন। এদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। ফলে এরা রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বেন। এরা আর ভারতীয় নাগরিক থাকবেন না, ফলে সরকারি কোনো সুবিধা যেমন ১০০ দিনের কাজ, গৃহঋণ, শিক্ষার সংরক্ষণ, চাকরি কিছুই আর পাবেন না। ফলে এই অনুপ্রবেশকারীরা ধীরে ধীরে বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। এই অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। এরা বিতাড়িত হলে বাঙ্গালি হিন্দু আবার পশ্চিমবঙ্গে ৮০ শতাংশ হবে। বাঙ্গালি হিন্দু আবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মের অঙ্গন থেকে ইসলামি প্রাধান্য দূর করে ভারতীয় সভ্যতার আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে পারবে। বাঙ্গালি হিন্দু নিজেদের একমাত্র বাঙ্গালি বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ঘোষণা করবে বাঙ্গালির ইতিহাস ৫০০০ বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ, সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে, বেদ উপনিষদের দর্শন, আর্যভট্টের বিজ্ঞান, বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস, রামায়ণ মহাভারত— এইসব বাঙ্গালির উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকার যারা স্বীকার করেন না তারা বাংলায় কথা বললেও বাঙ্গালি নন, তারা বাংলাভাষী মাত্র তারা বাংলাদেশি। সেজন্য হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচতে হলে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন একান্ত প্রয়োজন। ■

মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে ‘দীপমালিকা মধুর মিলন’

কলকাতা মহানগরের বিশিষ্ট সেবা সংস্থা মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ৩ নভেম্বর মানিকতলার দধীচি ভবনে ‘দীপমালিকা মধুর মিলন’-এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সমাজসেবী জয়নারায়ণ দায়মা । বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিজয় কুমার রতাওয়া এবং শ্রীমতী অলকা কাকড়া। সংস্থার অধ্যক্ষ কেশরদেও তিওয়াড়ি সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। শ্রীমতী কাকড়া দীপাবলীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সবাইকে সামাজিক কাজে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এক বিশেষ শৈলীর অন্ত্যাক্ষরীর আয়োজন করা হয়। সবাই তাতে অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুকেশ শর্মা।

মদনপুরে স্বস্তিকা ও শঙ্খনাদের গ্রাহক সম্মেলন

গত ২ নভেম্বর নদীয়া জেলার মদনপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা ও সঙ্ঘের জাগরণ পত্রিকা শঙ্খনাদের গ্রাহক সম্মেলনের

আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ প্রচার প্রমুখ সুব্রত ভৌমিক এবং নদীয়া জেলা প্রচার প্রমুখ পার্থিব মুখার্জি। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন রাধেশ্যাম মাঝি।

দমদমে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ভাইফোঁটা

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি দমদম শাখার উদ্যোগে দমদম সরস্বতী লশিশুমন্দিরে ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়। একদিনের সূচনায় ২৫ জন বোন উপস্থিত হয়ে ৪৫ জন ভাইকে ফোঁটা দেয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং কলকাতা মহানগর কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করনে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহিকা মৌসুমী কর্মকার। সেদিনই বিবেকানন্দ নগরের সেবিকা বোনেরা তাদের সাহিত্য পরিষদের কার্যালয়ে ভাইফোঁটার আয়োজন করেন। ২৫ জন বোন ৪০ জন দাদা-ভাইকে ফোঁটা দেয়। এখানে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রচারিকা নমি সরকার।

শ্রীছোটি খাটু নাগরিক সমিতির দীপাবলী

গত ৩ নভেম্বর কলকাতার মৈঢ় ক্ষত্রিয় সভাগারে শ্রীছোটি খাটু নাগরিক সমিতির

উদ্যোগে দীপাবলী প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দশরথ চন্দ্র ভাণ্ডারী এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন হনুমান প্রসাদ কাসট ও বিমল চন্দ্র ভাণ্ডারী। বিশিষ্ট সমাজসেবী মহাবীর বাজাজ প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার সভাপতি গুলাব চন্দ্র মুন্ধা গণেশ বন্দনা করে অনষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে নৃত্য সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিনীত মুন্ধা ও সুশ্রী নিশী ভাণ্ডারী।

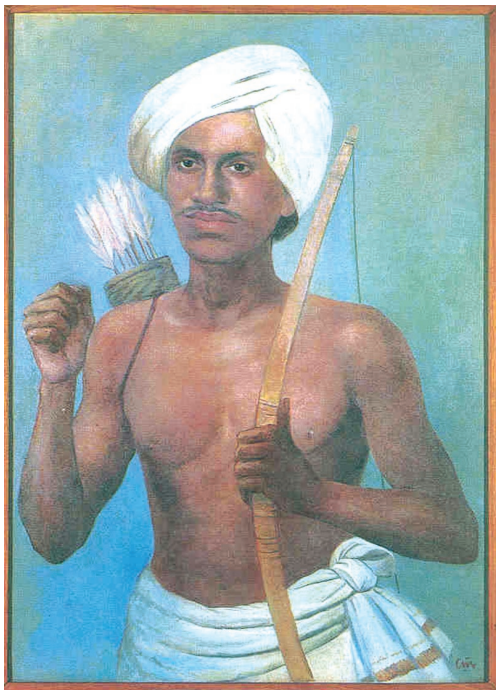

ধরিত্রীর দেবতা বিরসা মুণ্ডা

তারু মুণ্ডা

তাঁর সুন্দর মুখের দিকে যে একবার তাকাত, তাঁকে দেখতেই থাকত। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, সৌম্য মুখমণ্ডল— যেখানে রয়েছে সবাইকে আপন করে নেবার মতো অনন্য দীপ্তি আর তার সঙ্গে অভয় প্রদানকারী মৃদুহাস্য। দেহে যজ্ঞোপবীত, পায়ে খড়ম, মাথায় কুড়ি হাত লম্বা পাগড়ি। গায়ের রঙে সোনালি মাটির আভা। —এরকম ছিলেন সেই ধরতী আবা (ধরিত্রীর পিতা) দেবপুরুষ বিরসা।

তাঁর জন্মের সময় আকাশে পুচ্ছযুক্ত তারা দেখা গিয়েছিল। বৃহস্পতিবারে জন্ম— তার নাম রাখা হলো বিরসা। বয়স্ক ব্যক্তিরা, বললো— 'দেখো দেখো, ধরতী আবা জন্ম নিয়েছেন। এবার তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন।' 'উদ্ধার, হুঁ?' —অবিশ্বাসে হেসে ফেলেছিল পিতা সুগনা মুণ্ডা। 'যে ঘরে একদানা খাবার নেই, শরীরে পরিধানযোগ্য বস্ত্র নেই সেই ঘরে কখনও কোনো দেবপুরুষ জন্মায় নাকি?' কিন্তু মায়ের অন্তরের একটি কোণে আশা জেগে উঠত— সত্য একদিন বাস্তব হবেই। সবাই যখন বলেছে তখন আমার বিরসা নিশ্চয়ই একদিন 'ধরতী আবা' হবে। আমাদের নিজেদের রাজত্ব কায়েম করবে। এই সাদা চামড়ার ইংরেজ, এই মিশনারি জার্মান সবাইকে মেরে তাড়াবে। ওরে, বিরসা, তুই কবে বড়ো হবি রে? —ব্যাকুল সন্ত্রস্ত মায়ের আর্তস্বর ছড়িয়ে পড়ত গ্রামে।

যে গৃহে বিরসা জন্মেছিল, সেটা ছিল বাঁশের তৈরি। চালকাডের পাশে উলিহাতু ও বম্বা, দুটি গ্রামই বিরসার জন্মস্থান হবার গৌরবের দাবিদার। এমনটাই বিরসার জন্মতিথির বিষয়েও ভ্রমপূর্ণ প্রচার রয়েছে। কিন্তু চার্চে ব্যাপ্টিস্ম নেবার সময় যে জন্মতিথি (১৫/১১/১৮৭৫) দেওয়া হয়েছিল তাই পরে সর্বজনস্বীকৃত হয়।

বিরসার বাল্যকাল অন্যান্য শিশুদের মতো ধুলোয় গড়িয়ে, বনে ঘুরে এবং পশু চরিয়ে কাটলেও অসামান্য ছিল। ওর বন্ধুরা মাঝে মাঝেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা শুনত ওর মুখ থেকে। এত সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারত বিরসা যে বনের পশু-পাখিও মুগ্ধ হয়ে তা শুনত। গ্রামের আখড়ায় যখন সে ঝুমঝুম করে নাচত তখন মনে হতো স্বর্গীয় কেউ যেন পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করছে।

কিন্তু এ সবে তো পেট ভরবে না। সেজন্য চাই খাদ্য। দারিদ্র্য তার পিতামাতাকে বাধ্য করল তাকে তার মাসির বাড়ি খুঁটি থানার খটঙ্গা গ্রামে রেখে আসতে। বিয়ের আগে থেকেই মাসি ওকে খুব ভালোবাসত। সেখানে সে সারাদিন ঘুরত আর মেসোর ছাগল চরাত। কিন্তু বাঁশি বাজাতে বাজাতে সে এত তন্ময় হয়ে যেত যে ছাগল অন্যের জমিতে ঢুকে ফসল খেল কিনা তা খেয়াল থাকত না। এই রকমই একটি ঘটনার পর মেসো একদিন প্রচণ্ড মারল বিরসাকে। ভয়ে বিরসা পালিয়ে এলো বাবার কাছে। পিতা সুগনা আবার বিরসাকে রেখে এলো দাদুর কাছে আয়ু ভাতু গ্রামে। এখানে থাকাকালীন বিরসা পাশের গ্রামে সাল্‌গার জয়পাল নাগ নামে এক শিক্ষকের পাঠশালায় লেখাপড়া ও অঙ্কের প্রাথমিক পাঠ শেষ করল। ওই পাঠশালা সরকার স্বীকৃত না হওয়ায় নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার জন্য বুর্জুর জার্মান মিশনে বিরসা ভর্তি হলো। ইতিমধ্যে দারিদ্র্য বিরসার পিতাকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করলো। তার নাম হলো মসীহ দাস। বুর্জু মিশনে বিরসার ব্যাপ্টিস্ম হলো। নাম রাখা হলো দাউদ বিরসা। এরপর আরো পড়ার জন্য বিরসাকে যেতে হলো চাইবাসার সুথেরান মিশনে। এখানেই বিরসা খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারল এবং তার শরীরে মনে খ্রিস্টান মিশনারি ও ইংরেজের প্রতি ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠলো। চাইবাসা মিশনের পাদরি ডাঃ নট্রোটের সামনেই বিরসা মিশনারিদের নিন্দা করে ঘোষণা করল— 'সাহেব সাহেব এক টোপি'।...

চাইবাসা থেকে ফিরে শুধু বিরসাই নয়, তাঁর সম্পূর্ণ পরিবার মিশনারিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরপর প্রায় এক বছর বিরসা কণ্ডের গ্রামে এক মুণ্ডা পরিবারে কাজ করেছিল। ১৮৯১ সালে তোড়ন থানার গোড়বেড়া গ্রামে আনন্দ পাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় হয়। আনন্দ পাণ্ডে বন্দগাঁওয়ের জমিদার জগমোহন সিংহের মুন্সী ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি বিরসাকে রাতে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি শোনাতেন। একজন বৈষ্ণব সাধুও সেখানে প্রায়ই আসতেন। এঁদের সকলের প্রভাব পড়ল বিরসার ওপর। বিরসা শিকার করা ছেড়ে দিল আর তাঁর অন্তরে প্রথম থেকেই যে ভক্তিধারা সুপ্ত ছিল এই সব সৎসঙ্গে তা আরও পুষ্ট ও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আনন্দ পাণ্ডেকে গুরুরূপে স্বীকার করে বিরসা নিজের ধ্যেয়পথে সাফল্য লাভের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো। কী ছিল ধ্যেয় বিরসার? আমাদের দেশকে বিদেশির শাসন থেকে মুক্ত করা। গুরুও গদ্‌গদ্

কণ্ঠে অশ্রু পূর্ণ নয়নে বিরসাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে আশীর্বাদ দিলেন।

এরপর বিরসা সরদারি লড়াইয়ে অধিক সক্রিয় হলো। এখানে সরদারি লড়াই সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। এতদ্ অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারিদের আসার পর থেকে বনবাসীদের সমস্যা বেড়ে যায়। তারা নিজেদের বনবাসীদের হিতরক্ষক বলে ঘোষণা করেছিল আবার লোভ দেখিয়ে সরল সাদাসিধে বনবাসীদের খ্রিস্টানও করেছিল। লোভ ছিল— যদি বনবাসীরা ক্রসকে মেনে নেয় তো ইংরেজ সরকার তাদের পক্ষে থাকবে এবং তাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। তারা জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধেও সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এ সবই ছিল ইংরেজ অফিসার ও পাদরিদের কুটিল ষড়যন্ত্র। পরিণামস্বরূপ, যারা খ্রিস্টান হলো সেই বনবাসীদেরই সব সুবিধা মিলতে লাগলো যা আগে ছিল সকলের অধিকার। অতএব, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে জমি ও নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য বনবাসীরা আন্দোলন শুরু করেছিল যা ইতিহাসে 'সরদারি লড়াই' নামে প্রসিদ্ধ। এই সরদারি লড়াইয়ের গভীর প্রভাব পড়েছিল বিরসার ওপর।

গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে বিরসা গ্রামে গ্রামে কোম্পানির সরকার ও পাদরিদের বিরুদ্ধে গণসংগঠন তৈরি করা শুরু করলো। সেই সঙ্গে আয়ুর্বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নও চলতে থাকলো। বনবাসীরা তাঁর প্রতিজ্ঞা ও জ্ঞানে প্রভাবিত হয়ে তাঁর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হতে লাগলো।

কিন্তু পরিবারের আর্থিক স্থিতি ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে লাগল। আর আন্দোলনে ব্যস্ত বিরসা ঘরের খাবার কোথা থেকে জুটাবে? এমনই অবস্থা হলো যে, বিরসা ভাই-বোনদের নিয়ে বাবা-মার সঙ্গে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ত। বিরক্ত হয়ে একদিন খাবারের সন্ধানে বিরসা বাইরে ঘুরছিল। ক্ষুধা ও চিন্তায় ব্যাকুল বিরসা শ্মশানে গিয়ে পৌঁছালো। সেখানে সে এক গর্ভবতী মহিলাকে গয়নাগাটিসহ কবর দিতে দেখলো। ক্ষিধের জ্বালায় মানুষ কী না করে! সবাই চলে গেলে বিরসা সেই তাজা কবর খুঁড়ে মৃতার শরীর থেকে গয়না নিয়ে বাজারের দিকে গেল। গয়না বিক্রি করে চাল-ডাল-নুন কিনলো। ভাবলো— আজ সবার পাতায় গরম ভাত দেওয়া হবে। আহা! কতদিন পর আজ অন্ন জুটবে ভাগ্যে। খাবারের চিন্তায় বিরসা কাজের পরিণামও চিন্তা করতে ভুলে গেল। একবারও ভাবলো না এই গয়না বিক্রি করতে গ্রামের লোক দেখে থাকতে পারে এবং গ্রামের সবাই হয়তো জেনে গেছে যে, বিরসা কবর থেকে তোলা মৃতদেহের গয়না বিক্রি করে চাল ডাল কিনে আনছে ঘরে। গ্রামে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বিরসার দিকে ঘৃণাভরে তাকালো। ঘরে যেতেই মা চীৎকার করে বলে উঠলো— হায়রে বিরসা। মরা মানুষের পয়সায় তুই এবার আমাদের খাওয়ার খাওয়াবি? তোর এই চাল নিয়ে যা, নিজের মুখ কালো করবি যা।' স্তব্ধ, আহত বিরসা হাত থেকে চাল-ডাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। গ্রামের লোক তাকে 'বলু বিরসা' (পাগল বিরসা) বলতে লাগল।

বিরসা জঙ্গলে গিয়ে ১২/১৩ দিন কাটালো। জঙ্গলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর বিরসা নিজের জীবন, সমাজের অবস্থা এবং সময়ের আহ্বান কী— এই গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। এই সময়েই সে এক স্বপ্ন দেখলো যা তাকে পরবর্তীকালে সত্যিই ধরতীর দেবতা বানিয়ে দিল।

জঙ্গল থেকে ফিরে বিরসা গ্রামবাসীদের ডেকে বললো— ''স্বপ্নে আমি এক পক্ককেশধারী বৃদ্ধকে দেখেছি যিনি হাতে একটি ছড়ি নিয়ে চলছিলেন। ওই বৃদ্ধ ক্ষেতের মধ্যে একটি চেয়ারের ওপর বসলেন এবং একটি মহুয়া গাছ তৈরি করলেন। ওই গাছটা এতটা চকচক করছিল যেন তাতে মাখন আর তেল লাগানো হয়েছে। ওই গাছের মাথায় অতি মূল্যবান বস্তু ছিল। ওই বৃদ্ধ চারজনকে ডাকলেন এবং ওই গাছে উঠে মূল্যবান বস্তুটি পেড়ে আনতে বললেন। প্রথমে এক আত্মা। তারপর এক রাজা, তারপর একজন বিচারক এবং চতুর্থ ছিলাম আমি স্বয়ং। ওরা তিনজনই চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কিন্তু আমি ওই বস্তুটা পেয়ে গেলাম। কিন্তু যেই বস্তুটা নিয়ে গাছ থেকে নেমে সেটা ভালে করে দেখতে গেলাম আমার ঘুম ভেঙে গেল।''

বিরসা এও বলেছিল যে, 'সিঙ্গ বোঙ্গা তাঁকে দিব্য শক্তি প্রদান করেছেন এবং এখন সে সবরোগীকে রোগমুক্ত করতে পারে। আরও বললো— 'এবার আমি খুব তাড়াতাড়ি মুণ্ডাদের বিদেশির বন্ধন থেকে মুক্ত করবো, এখন থেকে কেউ যেন কোম্পানি সরকারের আদেশ না মানে। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, জমিদারদের অবজ্ঞা করবে আর কেউ বেগার খাটবে না।'

বিরসার কাছে দূরদূরান্ত থেকে দুঃখী, পীড়িত, রোগী বনবাসীরা আসতে লাগলো। যাদের কখনও মন্ত্রবলে, কখনও বা শিকড়বাকড় দিয়ে ও রোগমুক্ত করে দিতো। বনবাসীদের মধ্যে দাবানলের মতো এই খবর ছড়িয়ে পড়লো যে বিরসার মধ্যে দৈবশক্তি রয়েছে এবং সে সবাইকে দুঃখ-ক্লেশ থেকে মুক্ত করতে পারে। বিরসার এই আশ্চর্য্য শক্তির বর্ণনা পাদরিও খুব অদ্ভুতভাবে করেছে— 'অসুস্থ, কানা, বোবা, খোঁড়া মাইলের পর মাইল দূর থেকে আসত বিরসাকে দর্শন করতে। ভীষণ গরম থাকুক বা ঝড়-বৃষ্টি যাই হোক না কেন সেই ভক্তদের ওপর কোনো প্রভাব পড়তো না। তারা কেবল বাঁশের তৈরি ছাতা নিয়েই সব বিপদের সম্মুখীন হবার সাহস করতো।'

আকাশে এক নতুন নক্ষত্র উদিত হয়েছে— 'ধরতী আবা'। যিনি বনবাসীদের বাঁচাতে, উদ্ধার করতে এসেছেন— সকলের ধমনীতে নবীন প্রেরণার রক্তস্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো। নতুন উৎসাহের সঞ্চার হলো। ওরাঁও, মুণ্ডা, খাড়িয়া— সবাই চালকাড়ে নিজেদের নতুন দেবতাকে দর্শন করার জন্য ভেঙে পড়লো। আর সেই ধীর গম্ভীর পুরুষ সবাইকে বলেছিলেন— ''সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন পাদরি, সরকারি অফিসার আর মহারানি (ভিক্টোরিয়) আমার চরণে পড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে। এসো, আমরা সংগঠিত হই, এই মহারানির রাজত্ব শেষ করি। এবার শুরু হবে আমাদের রাজত্ব। আবুয়া রাজ এয়তে জনা, মহারানি রাজ টুণ্ডু জনা।'' আর শত শত কণ্ঠ অমনি চিৎকার করে উঠতো— ''আবুয়া রাজ এয়তে জনা, মহারানি রাজ টুণ্ডু জনা।''

এটা ছিল ১৮৯৫। যখন কংগ্রেস ইংরেজের কোলে শুয়ে ব্রিটিশ দুধে প্রতিপালিত হচ্ছিল, যখন তিলকের 'স্বরাজ আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার— এর মন্ত্র দেশে গুঞ্জিত হয়নি, যখন গান্ধী, সুভাষ, নেহরুর

নাম দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়নি, সেই সময় ছোটোনাগপুরের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র বনবাসী ক্ষেত্রের এই দেবদূত 'স্বরাজ্য' ঘোষণা করে ব্রিটিশ প্রশাসনকে প্রচণ্ডভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। আশ্চর্য! একই সঙ্গে বিরসা অত্যন্ত মনোবৈজ্ঞানিক ঢঙে বনবাসী সমাজে পরিব্যাপ্ত অন্ধবিশ্বাস ও কুরীতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

এই সমস্ত ঘটনায় খ্রিস্টান মিশনারিরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। প্রথমে তারা এটাকে 'মুর্খতাপূর্ণ অস্থায়ী উত্থান' বলে ভেবেছিল। কিন্তু পরে সব কিছু গম্ভীরভাবে চিন্তা করে নিজেদের ইংরেজ অফিসারদের কাছে ছুটে গেল। ওদিকে তামাড় থানার দারোগা ডেপুটি কমিশনারের কাছে রিপোর্ট পাঠালো— 'একজন নতুন হিন্দু রাজা হয়েছে যে বনবাসীদের ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে এবং জবরদস্তি হিন্দুদের ধর্মীয় নিয়মকানুন চালু করছে।' চক্রধরপুরের থানা থেকেও রিপোর্ট গেল— 'একজন সন্ন্যাসী বনবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ চড়াচ্ছে।'

এ দিকে বিরসা বিদ্রোহের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এক অভিনব অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি বনবাসীদের চাষ করতে নিষেধ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, 'ইংরেজ সরকার এখন শেষ হয়ে গেছে।' চাষ না করার খবরে ব্রিটিশ অফিসাররা ভীত হয়ে পড়লো এবং যথাশীঘ্র বিরসাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ জারি করল ৮ আগস্ট ১৮৯৫ বিরসাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ চালকাড এল। কিন্তু বিরসাকে ছুঁতেও পারল না। গ্রামবাসীদের সশক্ত প্রতিরোধ এবং তাদের মেরে ফেলার হুমকি শুনে বন্দুকধারী পুলিশরাও কাঁপতে থাকলো। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক পলুস-এর নেতৃত্বে প্রায় দুশো খ্রিস্টান বনবাসী পুলিশদের সাহায্য করতে এসেছিল। তাদের সবাই প্রায় মুণ্ডা বনবাসী। ধর্মান্তরিত হলেও তারা রক্তের আসল পরিচয় রাখলো। আশপাশের গ্রাম থেকে আট-নশো বনবাসী একত্রিত হয়ে পুলিশদলকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

বৈষ্ণব সাধুদের শিক্ষার প্রভাবে বিরসা অহিংসার পথেই চলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের হিংসামূলক মনোভাব দেখে 'বিষস্য বিষমৌষধম্' নীতি গ্রহণ করে নিজের বিশ্বস্ত সহচরদের নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের যোজনা তৈরি করলেন এবং তার প্রস্তুতিতে লেগে পড়লেন। ইংরেজ অফিসারদের কাছে এ খবর পৌঁছালে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৩ আগস্ট কমিশনার একটি জরুরি বৈঠক ডেকে বিরসার বিদ্রোহ দমন করার আদেশ দিলেন। বিরসাকে গ্রেপ্তার করার দায়িত্ব দেওয়া হলো জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি আর. কে. মিয়ার্সের ওপর। বিরসার তিনশত্রু— পাদরি লাস্টি, জেনারেল মিয়ার্স এবং জমিদার জগমোহন হাতিতে চেপে বাছাই করা ২০ জন সৈনিক নিয়ে সন্ধ্যাবেলা চালকাড পৌঁছাল। চারিদিক থমথমে। চুপচাপ গ্রাম ঘিরে পুলিশ বিরসার ঘরে হামলা করতে ঢুকে পড়ল। সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত বিরসা ঘরে তখন বিশ্রাম করছিলেন। চটপট দশজন পুলিশ বিরসাকে জাপটে ধরলো এবং হাতকড়ি পরিয়ে দিল। বিরসা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। ওই সময়ে তাঁর সহযোগী যোদ্ধারা সুদূর গ্রামাঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র একত্রিত করা এবং বিদ্রোহের ডাক দেবার জন্য চলে গিয়েছিল। তারা ভাবতেও পারেনি ব্রিটিশ পুলিশ এরকম চুপিসারে বিরসাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু বিরসাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এ খবর দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার বনবাসী চালকাডের দিকে ছুটল। কিন্তু ততক্ষণে বিরসাকে অনেকদূর নিয়ে গেছে— রাঁচী জেলে। বনবাসীদের ক্ষোভ এবং নিজেদের দেবতার দুঃখের পীড়া চরম সীমায় পৌঁছে গেল। তাই হাজার হাজার বনবাসী খালি পায়েই ছুটলো রাঁচী জেলের দিকে। কিন্তু পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের হটিয়ে দিল। মুণ্ডাদের উৎসাহ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কমিশনার বিরসার মামলা ঢালকাডেই চালাবার পরিকল্পনা করলেন যাতে প্রমাণ করা যায় যে, ওই সব জংলি লোকেদের দেবতা প্রকৃতপক্ষে একজন অপরাধী। হাতকড়ি পরানো অবস্থায় বিরসাকে চালকাডে আনা হলো। আর খবরও ছড়ানো হলো যাতে দূরদূরান্ত থেকেই সবাই এসে এ মামলার পরিণতি দেখে। হাজার হাজার বনবাসী এই অপমানে প্রস্তরবৎ হয়ে পড়ল। বন্দি বিরসাকে দেখেই তাদের রক্ত টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো। ডেপুটি কমিশনারের গোঁফ উপড়ে ফেলা হলো আর হাজার হাজার বনবাসী হিংস্র হয়ে উঠল। বেগতিক দেখে হঠাৎ মামলার শুনানি বন্ধ করে অতিরিক্ত পুলিশের সাহায্যে বিরসাকে রাঁচিতে ফিরিয়ে আনা হলো। ১৯ নভেম্বর ১৮৯৫ বিরসার বিচারের রায় বের হলো এবং তাতে বিরসার দু' বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয়মাস জেলের সাজা হলো। ৩০ নভেম্বর, ১৮৯৭ বিরসা জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

বিরসার মুক্তিতে ব্যাধিগ্রস্ত, ক্লান্ত শ্রান্ত বনবাসীদের মধ্যে প্রাণ ফিরে এল। সারা এলাকার বনবাসীদের প্রাণে মনে আগুন জ্বলছিল। অন্তিম আঘাতের আগে বিরসা দেবতার আশীর্বাদ নেবার জন্য নিকটবর্তী নওরতনগড়, চুটিয়া ও জগন্নাথপুরে তীর্থ করতে গেলেন। এও শোনা যায় যে, বিরসা নিজের সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রাও করেছিলেন। অবশ্য এই বৃন্দাবন রাঁচির কাছে অবস্থিত একটি গ্রাম।

চুটিয়া মন্দিরের কাহিনি ঐতিহাসিকরা বিকৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন। বিরসা চুটিয়া মন্দিরে গিয়ে তুলসীগাছ, নওরতনগড়ের মন্দির থেকে যজ্ঞোপবীত এবং জগন্নাথপুরের মন্দির থেকে চন্দন এনে সহযোগীদের মধ্যে প্রসাদ রূপে বিতরণ করেছিলেন আর নিজেদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। বলেছিলেন— 'ধৈর্য ধরো, খুব তাড়াতাড়ি সত্যযুগ আসছে'। এই জগন্নাথপুর মন্দিরে (রাঁচী থেকে ৬ মাইল দূর) মহিষবলির প্রথা ছিল। বিরসা এই ক্রূর প্রথার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করেছিলেন।

এরপর বিরসা ওড়িশার জগন্নাথপুরীতে গিয়ে ১৫ দিন তপস্যা করেন। এই সময় তিনি অন্ন গ্রহণ করেননি এবং পৃথিবীকে পাপমুক্ত করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। জগন্নাথপুরী থেকে ফিরে বিরসা গ্রামে গ্রামে সেনা তৈরির কাজে লেগে যান। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ডোম্বারী পাহাড়ে নিজের অনুগামীদের এক বড়ো সভায় আহ্বান করেন। চারদিক থেকে হাজার হাজার বনবাসী বিরসার

মহিমাগান করতে করতে কপালে চন্দনের তিলক, হাতে লাল ও সাদা পতাকা নিয়ে ডোম্বারীতে একত্রিত হলো। সাদা পতাকা পবিত্রতা ও স্বদেশির প্রতীক ছিল আর লাল পতাকার অর্থ ছিল বিদেশির রক্তে সাদা পতাকাকে লাল করতে হবে। সেদিন বিরসা বনবাসীদের মহান পূর্বপুরুষ, ধর্ম সংস্কৃতি এবং মাটির দোহাই দিয়ে ইংরেজ অফিসার, পাদরি ও তাদের দেশি এজেন্টদের সমাপ্ত করার উদাত্ত আহ্বান রাখেন। নিজের বিশ্বস্ত সঙ্গীদের মধ্য থেকে সেনাপতি ও মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেন। এটকে গ্রামের গয়া মুণ্ডাকে প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রীর পদ দিলেন।

সেনাদের মূল ঘাঁটি করা হলো খুঁটিকে। শত্রুদের ওপর হামলা করার উপযুক্ত দিন নির্দিষ্ট করলেন ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ সালে। ২৪ ডিসেম্বর রাত, ১৮৯৯। প্রধান সেনাপতি গয়ামুণ্ডা গুটু হাতু, সোইকো, কুড়াপূর্তি এবং আশপাশের গ্রামের বিরসা সেনানীদের ডোম্বারী পাহাড়ে ডাকা হলো। নিজের বাহিনীকে গয়া মুণ্ডা তিনভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ নিজের নেতৃত্বে রেখে সরবাদাগ মিশনে হামলা করতে প্রস্থান করলো। দ্বিতীয় ভাগকে মুঢু এবং তৃতীয় ভাগকে বুর্জু মিশন আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়ে গেল। ২৫ ডিসেম্বর গয়ামুণ্ডা নিজের ১০০ সঙ্গী নিয়ে সরবাদাগ মিশন আক্রমণ করলেন। মিশন কম্পাউণ্ড জ্বালিয়ে দিল এবং ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। ফাদারের বাংলোতে এসে ফাদার কারবেরি এবং ফাদার হাফম্যানের ওপর তির ছুঁড়লো। কারবেরীর বুকে তির লেগে ছিল কিন্তু গরম মোটা কোট পরে থাকায় মরলো না। ফাদার হাফম্যান তো একটুর জন্য বেঁচে গেল। দ্বিতীয় দল সেদিন মুঢু মিশন আক্রমণ করে, এখানকার ফাদার লাস্টি ছাত্রদের গান শুনছিল। স্বাধীনতার এই সেনানীদের তির চললে কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণ নিয়ে বাঁচলো লাস্টি। বুর্জু মিশনের পাদরি সরবাদাগ ও মুঢু-র খবর পেয়ে খুঁটি থেকে পুলিশ চেয়ে খবর পাঠালো। ২৬ ডিসেম্বর তৃতীয় দলটি সেখানে পুলিশের ওপর হামলা করে ৫ জন পুলিশকে খতম করলো জার্মান পাদরির কান ফুটো করে তির বেরিয়ে গেলেও সে প্রাণে মরলো না।

এই আক্রমণের পর সব দল ফিরে এল ডোম্বারী পাহাড়ে। ডোম্বারী ছিল বিরসার প্রধান কেন্দ্র। এখানে বসে বিরসা ও গয়ামুণ্ডা খুঁটি থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। সেনাদের আবার কয়েকটি দলে ভাগ করা হলো। প্রথম দলটির পরিচালনার দায়িত্ব নেন স্বয়ং বিরসা। দ্বিতীয় দলের দায়িত্ব আসে গয়া মুণ্ডার ওপর। বিরসা ৩০০ সেনা নিয়ে খুঁটি থানা আক্রমণ করেন। সেখানকার দারোগাকে মেরে ফেলা হলো। ৪/৫ জন পুলিশ আহত হলো। সংঘর্ষে বিরসার একজন সৈনিকও বীরগতি লাভ করে।

এদিকে গয়া মুণ্ডা দ্বিতীয় দলটি নিয়ে রাঁচীর দিকে যাত্রা করে। সেখানে তারা জার্মান মিশন আক্রমণ করে। একজনই কেবল তির বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আক্রমণ সফল হয়নি। গয়ামুণ্ডা বাহিনী নিয়ে ডোম্বারী ফিরে আসে। হামলার খবর রাঁচী শহরে ছড়িয়ে পড়লো। বিরসার আক্রমণের খবর পেয়ে রাঁচীর কমিশনার ফিয়ার্স ও ডেপুটি কমিশনার ফিল্ড আন্দোলনের দমন করার জন্য ইংরেজ বাহিনী নিয়ে খুঁটির দিকে অগ্রসর হলেন।

৯ জানুয়ারি ১৯০০। বেলা ১১ টায় ডোম্বারী পাহাড়ের ওপর গুলি চালানোর আদেশ দেওয়া হলো। পাহাড়ের উত্তর পূর্ব ও পূর্ব ভাগ থেকে গুলিবৃষ্টি হতে থাকলো। বনবাসী বাহিনী বিরসার জয়ধ্বনি দিয়ে পাহাড় থেকে নামতে লাগলো আর তির ও পাথর ছুঁড়তে লাগলো। কিন্তু গুলির কাছে তাদের তির ব্যর্থ হতে লাগল। পাহাড়ের ওপর প্রায় ২০০০ লোক ছিল। এর মধ্যে মহিলা, শিশুও ছিল। এই গুলি চালনায় প্রায় ২০০ ব্যক্তি মারা যায়। তাদের মধ্যে শিশুও বেশ কিছু ছিল।

এই ঘটনার পর ডি.সি. সেনার সাহায্যে বিরসার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা শুরু করলো। এই পরিস্থিতিতেও খ্রিস্টান পাদরিদের চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তারা বিরসার অনুগামীদের ধরিয়ে দিতো এবং যারা খ্রিস্টান হবে তাদের ছেড়ে দিত। গ্রেপ্তারির ভয়ে লোকেরা দলে দলে খ্রিস্টান হতে লাগলো। পাদরিরাও গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়ে খ্রিস্টান করতে লাগলো।

গ্রামে গ্রামে, জঙ্গলে-জঙ্গলে বিরসাকে ইংরেজ পুলিশ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু বিরসাকে তারা ধরতে পারলো না। বিরসা সিংভূম জেলার জোমেকাপাই জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন আর নতুন করে সেনা সংগঠনের কাজ শুরু করলেন। সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে রাতে গ্রামে আসতেন।

এই সময়ে রোগোতী গ্রাম ছিল তাঁর প্রধান কেন্দ্র। এদিকে কিছু লোক বিরসাকে ধরিয়ে দেবার তালে ছিল। তারা রোগোতীর জঙ্গলে গিয়ে বিরসার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নিজেদের তারা বিরসার শিষ্য বলে পরিচয় দেয়। বিরসা তাদের সঙ্গে দেখা করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। তারা ছিল দলে সাতজন। হঠাৎ তারা বিরসাকে জাপটে ধরে। বিরসা বুঝতে পারলেন যে, এরা সরকারি গুপ্তচর। কিন্তু বলবান বিরসা ওদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু মাইলখানেক যাবার পর আবার ওরা বিরসাকে ধরে ফেললো। পরে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশ বিরসাকে গ্রেপ্তার করে বন্দগাঁওয়ের ডাকবাংলোয় আটকে রাখলো।

এখানে বিরসাকে দর্শন করতে বনবাসীরা দলে দলে আসতে থাকে। বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখে শীঘ্রই পুলিশ তাঁকে পালকিতে চাপিয়ে রাঁচী নিয়ে আসে। বিরসা ও তাঁর ৮০ জন সঙ্গীকে রাঁচী জেলে রাখা হলো। কিছুদিন পরই সরকার ঘোষণা করে যে, বিরসা মারা গেছে। বলা হয়ে থাকে কলেরায় মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। বিরসার মৃতদেহ রাঁচী ডিস্টিলারির কাছে দাহ করা হয়। তাঁর সঙ্গীদের ওপর মোকদ্দমা চালানো হয়। দুই জনের ফাঁসি হয় আর বাকিদের ৩/৪ বছরের কারাবাস ভুগতে হয়। জনপ্রবাদ যে, জেলাশাসক বিরসাকে জমিদারির প্রলোভনও দিয়েছিলেন এবং আন্দোলন বন্ধ করার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিরসা কোনো প্রলোভনে পড়েননি আর দরিদ্র, নিপীড়িতদের উদ্ধারের জন্য শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ করার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে প্রকৃতই 'ধরতী কা আবা' হয়ে গিয়েছেন।

(জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

শীতকালীন অধিবেশনে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল পাশ হওয়া জরুরি

উর্মীশ্রী দেব

সংবিধানের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের সংসদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে দেশের নাগরিকত্ব লাভ ও নাগরিকত্বের অবসান নিয়ে প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করার জন্য। ওই অনুচ্ছেদের শিরোনাম 'Parliament to regulate the right of citizenship by law' আর সেই ক্ষমতা অনুসারেই সংসদে ১৯৫৫ সালের ৩০ ডিসেম্বরে পাশ হয় নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫। ইতিমধ্যে এই নাগরিকত্ব আইন বেশ কয়েকবার সংশোধনও হয়েছে। আর এই ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনটি আবার সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালের ১৯ জুলাই বাদল অধিবেশনে একটি সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করে। ২০১৬ সালের ১১ আগস্ট বিলটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পরীক্ষণের জন্য। এই বিল পেশ করে মোদী সরকার সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিলটি লোকসভার ওই বাদল অধিবেশন শেষ হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১১ আগস্ট, ২০১৬ আলোচনার জন্য আনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে বিজু জনতা দল, সি.পি.আই(এম), কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতায় আলোচনা ভেস্তে যায়। ওড়িশার কটক লোকসভা আসন থেকে আসা বিজু জনতা দলের সাংসদ ভারত্রোহারী মহাতব বলেন—"The Bill needs scrutinisation. Specific amendments have been listed in it. It needs a proper discussion. I would request the government to form a joint Committee and refer the matter to it and it should discuss the matter in a time bound manner." সেই সুরে সুর মেলান কংগ্রেসের জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, সি.পি.আই.(এম)-র সাংসদ মহম্মদ সেলিম এবং তৃণমূলের সাংসদ সুদীপ বন্দোপাধ্যায়। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বাধ্য হয়ে সংসদে বলেন বিলটি অধিক আলোচনার জন্য যৌথ সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে চাইলে সরকার পক্ষের কোনো আপত্তি নেই। আর তখনই সিদ্ধান্ত হয় বিলটি আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষণের জন্য যৌথ সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর। যৌথ সংসদীয় কমিটি ৪৪০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট দাখিল করে লোকসভায় ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি। রিপোর্ট দাখিলের প্রায় একঘণ্টা পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে 'সংশোধীত' নাগরিকত্ব বিলটি অনুমোদিত হয়। ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে লোকসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল। বিজেপি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার সুবাদে বিরোধীদের বিরোধিতা ধোপে টেকেনি লোকসভায়। আর রাজ্যসভায় বিজেপি সরকার বিলটি পাশ করানোর জন্য একদিনের জন্য রাজ্য সভার মেয়াদ বাড়ানো হয়। কিন্তু বিরোধীদের প্রবল বিরোধিতায় এবং রাজ্যসভায় বিজেপি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার জন্য বিল পেশ করেনি তৎকালীন বিজেপি সরকার। কংগ্রেস, বামপন্থী ও তাদের সমমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিবন্ধকতার জন্যই রাজ্যসভায় বিল পেশ করতে পারেনি মোদী সরকার। প্রতিবেশী দেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে আসা মানুষের যন্ত্রণার উপশম ঘটানোর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলি। তাদের বিরোধিতার একমাত্র স্বার্থ হচ্ছে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি। যেসব বিল লোকসভায় পাশ হয়েছিল কিন্তু রাজ্যসভায় পাশ হয়নি, সেগুলি তামাদি হয়ে গেল।

এখন দেখে নেওয়া যাক, বহু আলোচিত ও সমালোচিত লোকসভায় পাশ হওয়া নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলের সংশোধনীতে কী ছিল। প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পটভূমি কিন্তু সেই ১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক বিভাজন। কারণ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর ধর্মীয় নির্যাতন সর্বজনবিদিত। শুধু তা নয়, ওই সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণই করা হয়। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রালয়ের বাজেট। সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর লাগাতার আক্রমণের পিছনে রয়েছে একটিমাত্র কারণ, তা হচ্ছে 'এথনিক ক্লিনজিং', অর্থাৎ বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু-শূন্য দেশে পরিণত করা। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যাগুরুরা প্রকৃতপক্ষে চায় না বাংলাদেশে একটি হিন্দু পরিবারেরও অস্তিত্ব থাকুক। তাইতো চলছে ধারাবাহিক আক্রমণ। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারি জনগণনার রিপোর্ট। এই কারণেই ওদের ভারতে আশ্রয় নেওয়াটা অতি স্বাভাবিক। তাই কেন্দ্রের সরকার মানবিক কারণেই ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দু'টি রুলসের সংশোধনী করে তাদের ভারতে বসবাসের অধিকার দিল। আর বর্তমানে ওইসব নির্যাতিত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদেরকে ভাসমান না রেখে কেন্দ্র সরকার দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য সংসদে পেশ করেছে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬। যা রাজ্যসভায় পাশ হয়নি। এই বিলে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধন করার প্রস্তাব ছিল। বলা হয়েছিল ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে অবৈধভাবে আসা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টানরা ভারতে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অমুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য বিলে যে ধর্মীয় শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে তা আইনসঙ্গত কী না। কোনো কোনো সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বলছেন যে এই বিলে সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদক তাদের সঙ্গে একমত নন। সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে রয়েছে সাম্যের অধিকার (Right to Equality) এবং ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ধর্ম, জন্মস্থান, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ ও জাতির ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না (Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth)। প্রথমে বলে রাখা ভালো যে সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে। ওই অনুচ্ছেদের সুবিধা পাবেন না কোনো বিদেশি বা উদ্বাস্তু। তাই নাগরিকত্ব বিল অনুসারে পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, পারসি, শিখ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অতএব, যতদিন পর্যন্ত ওইসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন না ততদিন পর্যন্ত ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য বা লঙ্ঘন হবে না। এখন সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ নিয়ে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যাক। ওই অনুচ্ছেদ স্পষ্ট এইরূপ—'The State shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of India'. এই অনুচ্ছেদ ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা নাগরিকের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সমান প্রযোজ্য ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা প্রতিটি মানুষের উপর অর্থাৎ দেশি-বিদেশি সবার ক্ষেত্রে। ওই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা আইনের চোখে সবাই সমান (equal before law) এবং আইনের দ্বারা সবাই সমান সুরক্ষিত (equal protection of the law) এই দুটি ধারণা কিন্তু আমাদের সংবিধান প্রণেতারা আয়ারল্যান্ড এবং আমেরিকার সংবিধান থেকে লাভ করেছিলেন। আমরা যদি দুর্গাদাশ বসুর লেখা সংবিধানের বইটি পড়ি তখন দেখা যাবে equal protection বলতে গিয়ে বলা হয়েছে স্পষ্ট এইরূপ :– ''all individuals and classes will be equally subjected to the ordinary law of the land administered by the law courts''। কিন্তু ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনটি একটি বিশেষ আইন। আর সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ নিয়ে দেশের সর্বচ্চ আদালত ইতিমধ্যে বেশ কিছু মামলার রায় প্রদান করেছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য রায়টি ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৫২ সালের ১১ জানুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম আনোয়ার আলি সরকার মামলায়। বলাবাহুল্য, ওই রায়টি আজও বহাল রয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন মুখ্য বিচারপতি এম. পতঞ্জলি শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ওই রায় প্রদান করে। ওই রায় অনুসারে ন্যায়সঙ্গত শ্রেণীকরণ করা যায়। পিছনে থাকতে হবে ন্যায়সঙ্গত কারণ। অবশ্য শ্রেণীভিত্তিক আইন তৈরি করা যাবে না। ওই রায়ে মুখ্যবিচারপতি স্পষ্ট বলেছেন এইরূপ— '.....Article 14 of the Constitution does not mean that all laws be general in character and universal in application. The State must possess the power of distinguishing and classifying persons or things to be subjected to particular laws and in making a classification the legislation.' ওই মামলায় সুপ্রিমকোর্ট আরো বলেছে যে, 'just cause for discrimination is permissible on the basis of a real and substantial distinction relating to the objects sought to be achieved.' এইটুকু আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে প্রকৃত বা উপযুক্ত বাস্তবসম্মত পার্থক্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য আইনে বৈষম্য বা শ্রেণীবিভাজন করা যাবে। কাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে সেক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ১৪ নম্বর ধারা পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কেন্দ্র সরকার এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক এবং সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থও হওয়া যাবে না। অর্থাৎ নাগরিকত্ব প্রদান ও বাতিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ওরাই যাচাই করে দেখবে দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের আবেদনপত্র। তাই নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলে যে ধর্মীয় শ্রেণী বিভাজনের কথা বলা আছে আর সেটি যদি দেশের আইনপ্রণেতাদের সিলমোহর পড়ে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের যথাযথ জায়গায় স্থান পেয়ে যায়, তবে সেটি অসাংবিধানিক বা অযৌক্তিক হবে না। সেই শ্রেণীবিভাগ হবে ন্যায়সঙ্গত। তবে নতুন সংযোজন ও সংশোধন করে নাগরিকত্ব বিল যদি বর্তমান সরকার সংসদে পেশ করে এবং সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয় আর এই সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলে অসমের হিন্দুদের কথা চিন্তা করে কোনো ধারা সংযোজন করে তা হলে ১৯৫১ সালের তৈরি হওয়া এন.আর.সি এবং বর্তমানে অসমে তার নবীকরণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়া পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, পারসি, শিখ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকদের রেহাই দেওয়া হয়, তবে মোদী সরকারের উচিত সমগ্র দেশে এন.আর.সি চালু করা নতুবা হিতে বিপরীত হবে। এমনকী অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলিমরা সরকারি ভাবে রেজিস্টার্ড হবেন। যেমন অসমে হয়েছে। তাই প্রথমে সংসদে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে 'সু-স্পষ্ট' সংশোধন করে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙালি হিন্দুদের কথা মাথায় রেখে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পাশ করানো উচিত। তারপর সমগ্র দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিতারণের জন্য রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়ন দরকার সমগ্র দেশে। ■

খুনি ইয়াসিন মালিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের অফিসারদের হত্যা করার অপরাধে বহু অপরাধের নায়ক ইয়াসিন মালিকের বিচার হবে। কাশ্মীর নীতির অংশ হিসেবে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের তরফে ইয়াসিন মালিককে তারা সক্রিয়ভাবে সমাদর করত। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের সঙ্গে ইয়াসিন মালিককে ছবিতে দেখা গেছে।

একটা প্রচলিত সাধারণ প্রবাদ আছে যে, বিচার দেরিতে পাওয়া বিচার না পাওয়ার সমান। উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি নেতা ইয়াসিন মালিকের নির্যাতনের শিকার সেই হতভাগ্য পরিবার পরিজনদের প্রসঙ্গে এই প্রবাদটা নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে হয়। নানা কুকর্মের মধ্যে তার বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ যে সে ভারতীয় বিমান বাহিনীর চার চারজনকে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে খুন করেছে। এত বছর ধরে সে শুধু কার্যত পালিয়ে বেড়ানোর ব্যবস্থাই করেনি ভারতের সব প্রতিষ্ঠান তাকে সক্রিয়ভাবে তোষণ করেছে। তার মধ্যে আছে ২০০৬ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে নতুন দিল্লিতে তার সাক্ষাৎকার।

এখন শেষ পর্যন্ত নির্যাতিতদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আশার ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। কারণ অবশেষে ভারতীয় বায়ু সেনাদের খুন করা ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা রুবাইয়া সঈদের অপহরণের দায়ে জম্মুর টাডা আদালত মালিকের বিচার করবে। ভারতীয় বায়ুসেনাদের হত্যা করার প্রায় ৩০ বছর বাদে ১ অক্টোবর ২০১৯-এ এই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। এই সব তথ্যের আলোকে আমরা সংক্ষেপে দেখে নেব মালিকের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আছে। এই সব অপরাধ সাংঘাতিক। তা সত্ত্বেও আমাদের আগেকার সরকার ও নানা প্রতিষ্ঠান 'উপত্যকায় তথাকথিত স্বাভাবিক অবস্থা ফেরানোর জন্য' তাদের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাকে সর্ব প্রকারে তৎপরভাবে খাতির করে এসেছে অতি উৎসাহে।

সূচনা : ইয়াসিন মালিক এক কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদী, ১৯৬৬ সালে জন্ম। সে চায় ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশ থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করতে। সে জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের চেয়ারম্যান। সে কাশ্মীর উপত্যকায় সশস্ত্র জঙ্গি কার্যকলাপ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিত।

প্রথমে ইয়াসিন মালিক ছিল ইসলামিক ছাত্র লিগের (আইএসএল) সাধারণ সচিব। ১৯৮৭ সালে কাশ্মীর রাজ্যে নির্বাচনের পরে পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স থেকে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্তের বেড়া টপকে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। তার নিজের স্বীকৃত বয়ান অনুযায়ী সে ৩৫০০ জন কাশ্মীরি জিহাদিদের সঙ্গে করে একদা পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদের রাওয়ালপিণ্ডিস্থিত বিখ্যাত ফার্মহাউসে এই প্রশিক্ষণ নেয়। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে রশিদ আহমেদ বহুবার মালিককে সঙ্গে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ রেখায় চলে আসে। পরে ১৯৮৯ সালে মালিক উপত্যকায় ফিরে এসেছিল। তারপর সে জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জে কে এল এফ) কোর গ্রুপের সদস্য হিসেবে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠনে নাম লেখায়।

বিচারপতি নীলকণ্ঠ গাঞ্জুকে খুন : হাই কোর্টের বিচারপতি ও প্রসিদ্ধ কাশ্মীরি পণ্ডিত গাঞ্জুকে তিন জন সশস্ত্র জঙ্গি ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর শ্রীনগরে গুলি করে খুন করে। এই বিচারক ইতিপূর্বে খুনের মামলায় জেকেএলএফ সন্ত্রাসবাদী মকবুল ভাটকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল। মালিক এই খুনের অন্যতম অভিযুক্ত এবং একটা টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে নিজে গঞ্জুকে হত্যার কথা

কবুলও করেছিল।

রুবাইয়া সঈদের অপহরণ : তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা রুবাইয়া সঈদকে ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর অপহরণ করা হয় এবং শেষাবধি ভারত সরকার তার মুক্তির বিনিময়ে পাঁচজন জেলবন্দি সন্ত্রাসবাদীকে ছেড়ে দেয়। মালিক এই অপহরণ কাণ্ডেরও নেপথ্যে ছিল।

চারজন বায়ুসেনা আধিকারিককে খুন : অন্যতম বীভৎসতম অপরাধ যা ইয়াসিন মালিক সংঘটিত করেছিল তা হলো শ্রীনগরের উপকণ্ঠে চারজন ভারতীয় বায়ুসেনাকে খুন করা। সাংবাদিক আদিত্য রাজ কল অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯৯০ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রায় ১৪ জন ভারতীয় বায়ুসেনা আধিকারিক রাওয়ালপুরা চকের কাছে একটা বাসস্টপে অপেক্ষা করছিল। তারা ভারতীয় বায়ুসেনার বাসে করে নিকটবর্তী বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত ছিল। সেই সময়ে একটা জিপসি গাড়ি আর বাইক অকুস্থলে এসে দাঁড়ায় এবং একে-৪৭ রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে সজ্জিত পাঁচ জন সশস্ত্র উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদী ভারতীয় বায়ুসেনা আধিকারিকদের উপর গুলি বর্ষণ করে। আচমকা এই আঘাতে হতচকিত হয়ে বায়ুসেনারা মাটিতে শুয়ে পড়ে কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা ততক্ষণে চারজনকে খতম করে দেয়; এই চার নিহতের মধ্যে ছিল স্কোয়াড্রন লিডার রবি খান্না, কর্পোরাল ডিবি সিংহ, কর্পোরাল উদয় শঙ্কর এবং এয়ারম্যান আজাদ আহমেদ। প্রত্যক্ষদর্শীরা পরে পুলিশকে বলেছে যে খান্না গাড়িতে বসা ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত ভারী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আঘাত থেকে অধস্তন কর্মীদের বাঁচানোর জন্য এই আক্রমণের সব ধাক্কা নিজের উপর নিয়েছিল।

এর পরে তারা সেই আক্রমণের জন্য ওই স্থানে উৎসব পালন করে, পালাবার আগে জিহাদি স্লোগান দিতে দিতে যায়। মালিকই এই অতর্কিত আক্রমণের মূল চক্রী বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

কীভাবে সে ছাড়া পেল : ১৯৯০ সালের আগস্টে মালিককে নিরাপত্তা রক্ষীরা

ভারতীয় বায়ুসেনা আধিকারিকদের হত্যা করার অপরাধ ছাড়াও রুবাইয়া সঈদকে অপহরণের জন্যও কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো ইয়াসিন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবে। তবে স্কোয়াড্রন লিডার রবি খান্নার স্ত্রী নির্মল কুমারী খান্না বলেন দ্রুত বিচার শেষ করতে হবে যাতে ইয়াসিন মালিক ও অন্যান্য অপরাধীরা তাদের পাপের শাস্তি পায়।

গ্রেপ্তার করে। সে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কারান্তরালে ছিল। ওই বছরেই জামিন পায়। তারপর সে ঘোষণা করে সে হিংসা ছেড়ে দেবে, গান্ধীবাদী হবে। ১৯৯৫ সালে রুবাইয়া সঈদের মামলায় জম্মু ও কাশ্মীর আদালতের গঠিত একজন বিচারকের বেঞ্চ স্থগিতাদেশ জারি করে। একাধিক ঘটনায় যখন তাকে অল্প কালের জন্য কারাবন্দি করা হয় সে মাঝখানের সময়টাতে দিল্লির জনারণ্যে ভিড়ে যেত। সে নিজে স্বীকার করেছে সে ২০০১ সালে একবার এক সাংবাদিকের বাড়িতে মনমোহন সিংহের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সে সোনিয়া গান্ধীর বাড়িতেও ২০০৩ সালে দেখা করতে গিয়েছিল। ২০০৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তাকে সরকারিভাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের অফিস থেকে আলাপ আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

২০০৮ সালে মালিক বিশেষ আদালতে যায়, সে বলে যে বিচারকারী আদালতকে যেন শ্রীনগরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ অমরনাথ যাত্রার গোলমালের কারণে তাকে নিরাপত্তাজনিত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে; সেই সময়ে একটা ধর্মীয় কারণে আন্দোলন চলছিল, হিন্দুরা নাকি বহিরাগত (৩৭০ ধারার কারণে) তাই যাত্রার কালে অস্থায়ীভাবে হিন্দুদের জন্য যে জায়গা লিজ দিতে হয়েছিল তাই নিয়ে মুসলমানরা বিরোধিতা করছিল। তাই কাশ্মীর ও জম্মুর মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাদ চলছিল।

শেষ পর্যন্ত আইন তাকে ধরল : ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে জম্মু ও কাশ্মীর উচ্চ আদালত ২০০৮ সালের একজন বিচারকের বেঞ্চ যে রায় দিয়েছিল তাকে বাতিল করে, সেই রায়ে এই মামলার বিচারকে শ্রীনগরে প্রেরণ করা হয়েছিল। ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি মালিকের সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা শুরু করে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্তা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সংক্ষেপে এনআইএ) সন্ত্রাসবাদে অর্থ-জোগান সম্পর্কিত মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করে, এখন তাকে তিহার জেলে রাখা হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার মার্চ মাসে সন্ত্রাস-বিরোধী আইনে কাশ্মীর রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদে সমর্থন দেওয়ার জন্য জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে জম্মুর টাডা আদালত জে কে এল এফের প্রধান ইয়াসিন মালিকের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় সমন জারি করে।

ভারতীয় বায়ুসেনা আধিকারিকদের হত্যা করার অপরাধ ছাড়াও রুবাইয়া সঈদকে অপহরণের জন্যও কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো তার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবে। বিচারের চাকা অবশেষে ঘুরতে শুরু করেছে। তবে স্কোয়াড্রন লিডার রবি খান্নার স্ত্রী নির্মল কুমারী খান্না বলেন দ্রুত বিচার শেষ করতে হবে যাতে ইয়াসিন মালিক ও অন্যান্য অপরাধীরা তাদের পাপের শাস্তি পায়।

ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার সঙ্গে কথা বলার সময়ে পাবলিক প্রসিকিউটর পবিত্র সিংহ ভরদ্বাজ বলেন আগে পরপর যত সরকার এসেছে তারা কেউ ইয়াসিন মালিকের বিচার করেনি তাদের সে রাজনৈতিক ইচ্ছেই ছিল না। ■

সল্টলেকে আন্তর্জাতিকমানের টেবল টেনিস অ্যাকাডেমি

পশ্চিমবঙ্গের টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যসরকারের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা এক উন্নত ও আধুনিক পরিকাঠামো সংবলিত টেবল টেনিস অ্যাকাডেমি সল্টলেক স্টেডিয়ামের ২৫-২৬ র‍্যাম্পের ঠিক মাঝখানে এক চমৎকার পরিসরে যাত্রা করে দিয়েছে যা কিনা রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিময় খেলোয়াড়দের কাছে এক দিকচক্রবাল রচনা করেছে বলে জানালেন অ্যাকাডেমির চিফ কোচ তথা মেন্টর জয়ন্ত পুশিলাল। সম্প্রতি একান্ত আলাপচারিতায় তিনি জানালেন অ্যাকাডেমি ঘিরে তার স্বপ্ন ও পরিকল্পনার কথা।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

□ এই অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কারণ কী?

● **জয়ন্ত পুশিলাল :** বহু বছর ধরে টেবল টেনিসের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। প্রথম যৌবনে ক্রিকেট, ফুটবল সব খেলাই খেলতাম। কিন্তু দলগত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বেশি। বাড়ির আর্থিক অবস্থাও ততটা ভালো ছিল না। আর কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের ফলে সময়ও বেশি পাওয়া যেত না। তাই আউটডোর গেম ছেড়ে ইন্ডোর গেম টেবল টেনিসকেই জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছিলাম। খেলতামও বেশ ভালো। তাই খেলার অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে কোচিঙে চেলে আসি। চার দশক ধরে কোচিঙের সুবাদে বুঝতে পারি এরাজ্যে টেবল টেনিসের প্রতি একটা জন্মগত 'প্যাশন' রয়েছে ছেলে-মেয়েদের মনে। রাজ্য জুড়ে নানা জায়গায় চলে বহু কোচিংং ক্যাম্প। আমার যেমন আছে নারকেলডাঙা সাধারণ সমিতি। সেখান থেকে বহু ভারত চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় উঠে এসেছে আমার হাত ধরে। এরকম সব কোচিং ক্যাম্পই একাধিক চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় তৈরি করেছে। কিন্তু একটা সংগঠিত অ্যাকাডেমি থাকলে আর ভালো খেলোয়াড় উঠে আসতে পারে যারা শুধু দেশের মধ্যেই সেরা হয়ে থেমে যাবে না। বিদেশে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টেও পদক জিতে সমর্থ হবে। এই ভাবনা থেকেই অ্যাকাডেমি গড়ে ওঠা। রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি।

□ কতজন শিক্ষার্থী ও কোচ আছেন অ্যাকাডেমিতে?

● **জয়ন্ত পুশিলাল :** সব মিলিয়ে আপাতত তিরিশজন অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন রাজ্যের সিনিয়র র‍্যাঙ্কিং তালিকাভুক্ত। বাকিরা সব ৬-১২ বয়সসীমার মধ্যে। এই কচিকাঁচাদের তৈরি করাই অ্যাকাডেমির মূল লক্ষ্য। সিনিয়র তারকারা নিজেদের মান উন্নত করার সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছে। আবার তাদের সঙ্গে এক টেবলে অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলোর চোখ খুলে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা অন্য কোনো কোচিং ক্যাম্পে পাওয়া যাবে না। আর আমি ছাড়াও আরও বেশ কিছু রাজ্যস্তরের কোচকে নিয়ে আসা হয়েছে বা হবে।

□ অ্যাকাডেমির পরিকাঠামো সম্পর্কে কিছু বলুন?

● **জয়ন্ত পুশিলাল :** বিদেশে বহুবার গিয়েছি। আমাকে আমেরিকায় লস অ্যাঞ্জেলস অ্যাকাডেমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আমার কোচিঙে থেকে ৩-৪ জন মার্কিন জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভারতে আমার হাত থেকে ১৫ জন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বেরিয়েছে। আমি জানি কীভাবে চ্যাম্পিয়ন তৈরি করতে হয়। কিন্তু তারা একটা স্তর পর্যন্ত গিয়ে আটকে যাচ্ছে, কারণ ওই সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও মনোবিদের সাহায্য না পাওয়া। এই অ্যাকাডেমিতে রয়েছে কোচিংয়ের পাশাপাশি সমস্ত রকমের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। আছে আধুনিক ড্রেসিংরুম, ভিডিয়ো অ্যানালিসিস রুম, জিম সব কিছু। যাতে খেলোয়াড়দের মানসিক গঠন সুদৃঢ় হয় তার জন্য মনোবিদ সাহচর্য। বিদেশে যেরকম আধুনিক উন্নত পরিকাঠামো ও পরিষেবার সুযোগ মেলে সেরকম সব ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে বড়ো খেলোয়াড় থেকে শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই নিজেদের পছন্দ মতো শারীরিক ও মানসিক গঠন কাঠামোটিকে তৈরি করে নিতে পারে। আর বিশেষ ভাবে বলতে হয় টেবল টেনিস এডুকেশন ব্যবস্থা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার শিক্ষা পদ্ধতি। এখন সব খেলাতেই এসে গেছে এই শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

□ ভারতের টেবল টেনিস এবার কি আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হবে?

● **জয়ন্ত পুশিলাল :** অবশ্যই হবে। মহারাষ্ট্রে খুবই ভালো অ্যাকাডেমি হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও হবে। পশ্চিবঙ্গে হয়ে গেল। বিদেশি উন্নতমানের পরিকাঠামো ও পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে এদেশের ছেলে-মেয়েরাও পাল্লা দিতে সক্ষম হবে আন্তর্জাতিক তারকাদের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই শরত কমল, পি সাহিয়ান, মলিকাবাত্রায় বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সার্কিটে ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এর পর ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিভা উঠে আসবে যারা ওদেরকেও ছাপিয়ে যাবে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে শুধু কমনওয়েলথ গেমস নয় এশিয় ও বিশ্ব মিটেও পদকের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে ভারতীয়রা। ■

পশ্চিমবঙ্গের জনক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

ছোটো বন্ধুরা, আমরা অনেক মহাপুরুষের কথা আমরা জানি। আজ আমরা ভারতমাতার বীরসন্তান

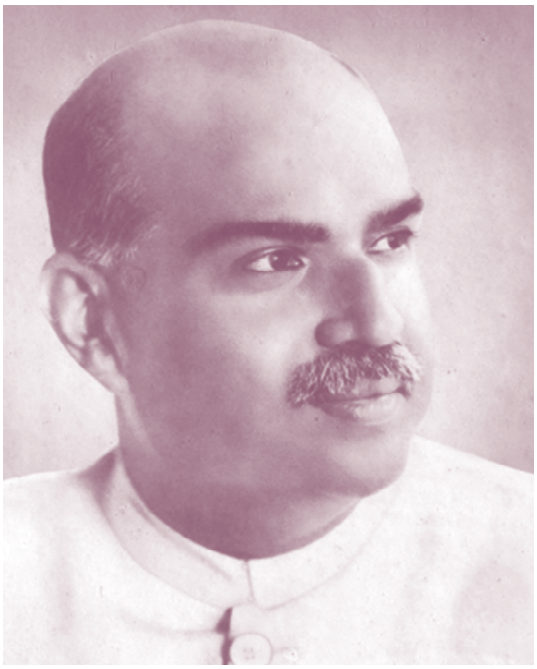

পশ্চিমবঙ্গের জনক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা আলোচনা করব। শ্যামাপ্রসাদের বাবা ছিলেন বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখার্জি। মা যোগমায়া দেবী। আশুতোষ মুখার্জি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। ১৯০৯ সালের ৬ জুলাই কলকাতার ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম হয়। ছোটো থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে স্কলারশিপ পেয়ে পাশ করেন। ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট হয়ে বিএ পাশ করেন। ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে বাংলায় এমএ পাশ করেন। ১৯২৪ সালে লন্ডনে যান ব্যারিস্টারি পড়তে। ১৯২৭ সালে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন। ২৩ বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে নির্বাচিত হয়ে পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য হন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। এত কম বয়সে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হওয়া খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। এসময় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি করেন।

সেসময় আমরা ইংরেজদের অধীনে পরাধীন ছিলাম। বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু মুসলিম লিগ নামে একটি দল হিন্দুদের ওপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ১৯৪০ সালে তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ও বীর সাভারকরের অনুপ্রেরণায় হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়ে মুসলিম লিগের অত্যাচার থেকে হিন্দুদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। সেসময় মুললিম লিগের নেতা ছিলেন জিন্না। তিনি মুসলমানদের জন্য ভারত ভাগ করে পাকিস্তানের দাবি করেন। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশমাতৃকাকে ভাগ করতে রাজি ছিলেন না। তখন মুসলিম লিগের লোকেরা পাকিস্তান আদায়ের জন্য প্রথমে কলকাতায় ও কয়েকদিন পরে নোয়াখালিতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। ওই আক্রমণে কলকাতা ও নোয়াখালিতে হাজার হাজার হিন্দু মারা পড়ে, হাজার হাজার হিন্দু মা-বোনের সম্মান নষ্ট হয়, হাজার হাজার হিন্দুর বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে লুটপাট করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অবশেষে ঠিক হয় ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান হবে। তখন জিন্না সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানে ঢোকাতে চাইলেন। তখনকার প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস জিন্নার এই দাবি মেনে নিলে শ্যামাপ্রসাদ তীব্র বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামেন। তিনি বললেন পাকিস্তানে মুসলিম লিগের হাতে হিন্দুরা বাঁচতে পারবে না। তাই হিন্দুপ্রধান এলাকা নিয়ে হিন্দু বাঙ্গালিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবি তুললেন। তাঁর তীব্র আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালিদের সুরক্ষিত ভাবে থাকার জায়গা হলো। কিন্তু তার পরেও মুসলমানদের ভীষণ অত্যাচারে দেড় কোটি হিন্দু পুর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিল। বড়ো হয়ে তোমরা দাদু-দিদিমা-ঠাকুমাদের কাছে সেই ভয়াবহ দিনের কথা জানতে পারবে। শ্যামাপ্রসাদ যদি সেদিন না থাকতেন তাহলে হিন্দুরা প্রাণ বাঁচাতে কোথায় যেতেন। তাই নিঃসন্দেহে শ্যামাপ্রসাদকে পশ্চিমবঙ্গের জনক বলা যায়।

স্বাধীন ভারতে শ্যামাপ্রসাদ প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার শিল্পমন্ত্রী হয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৫০ সালে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৩ সালে ৩৭০ ধারার প্রতিবাদে কাশ্মীরে গেলে সেখানেই তাঁকে করারুদ্ধ করা হয়। জেলখানায় রহস্যজনক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। অনেকে মনে করেন স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর হয়নি। তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

—প্রণব দত্ত মজুমদার

ভারতের পথে পথে

শ্রাবস্তী

ইতিহাসখ্যাত কোশলরাজের রাজধানী শ্রাবস্তী। অতীতের সাহেথ ও মাহেথ বর্তমানে হয়েছে শ্রাবস্তী। অচিরাবতী মাহেতে আছে মাটির বাঁধ, দুটি স্তূপ ও মন্দির। একটু দূরে সাহেথে আছে জেতবন বিহার। এর পূর্ব দ্বারে ছিল সম্রাট অশোকের তৈরি দুটি মিনার। সবই আজ ধ্বংসস্তূপ। খনন কাজের ফলে পাওয়া গিয়েছে কুশান ও গুপ্তযুগের নিদর্শন। এখানেই তথাগত বুদ্ধ সহস্র পাঁপড়ির পদ্মে বসে দিব্যজ্ঞানের অলৌকিকত্ব দেখিয়ে নাস্তিক কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিশ্বাস অর্জন করেন। তথাগত বুদ্ধের বিশ্ববিজয় যাত্রা শুরু এই শ্রাবস্তী থেকেই। এখানে নতুন ভাবে মন্দির তৈরি করেছে চীনা ও বার্মিজ বৌদ্ধরা। এখানে আছে বুদ্ধশিষ্য আনন্দের হাতে রোপণ করা আনন্দ বোধিবৃক্ষ। শ্রাবস্তী জৈনদেরও তীর্থক্ষেত্র। এখানে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বহুবার এসেছেন। রয়েছে সম্ভবনাথ মন্দির।

জানো কি?

- সপ্ত স্বর— ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ।
- সপ্ত ঋষি — পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু, মরীচি।
- অষ্ট ধাতু—সোনা, রুপা, তামা, দস্তা, টিন, সিসা, লোহা, পারদ।
- অষ্টাঙ্গ যোগ---যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।
- নবরত্ন— অমর সিংহ, ধন্বন্তরী, ঘটকর্পর, কালিদাস, ক্ষপণক, শঙ্কু, বরাহমিহির, বররুচি, বেতালভট্ট।
- নবরত্ন— মাণিক্য, মুক্তা, প্রবাল, মরকত, পোখরাজ, হীরক, নীলা, গোমেদ।

ভালো কথা

সত্যের জয়

গত ৯ অক্টোবর সকাল ১০ টায় বাবা-মা টিভিতে খবর দেখছিলেন। ১১ টার সময় বাবা চিৎকার করে 'জয় শ্রীরাম' বলে উঠলেন আর মা শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। আমি দৌড়ে কাছে যেতেই মা বললেন শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস এতদিনে শেষ হলো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। তখন বাবা রামমন্দিরের পুরো ইতিহাস বললেন। শুনতে শুনতে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। মা বললেন অযোধ্যায় তিন মাসের মধ্যে রামমন্দির তৈরি হবে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে। বাবা বললেন সত্যের জয় হলো। সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের পাড়ায় সবাই বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে আর একবার দীপাবলী পালন করল।

শুভদীপ সরকার, অষ্টম শ্রেণী, বিহারীটোলা,মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ঘু ন্দ র ন	(১) ন কু র ন ল ন্দ ঘু
(২) শ ঘু ব র	(২) মি রা জ ভু ম ন্ম শ্রী

৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) করালবদনা (২) মুণ্ডমালিনী

৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) বনমহোৎসব (২) ভোজনবিলাসী

উত্তরদাতার নাম

(১) শিল্পী রায়, গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি। (২) নমিতা বসুনিয়া, জামালদা, কোচবিহার। (৩) সুজন সাহা, হিলি, দ: দিনাজপুর। (৪) বিপ্লব দাস, পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১২।।

১৯২১ সালে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। ডাক্তারজী রইলেন পুরোভাগে। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরে প্রচার করলেন। শেষে ধরা পড়লেন।

কারাবাসকালে ডাক্তারজী সবাইকে সাহায্য করতেন, সদা প্রসন্ন থাকতেন এবং অন্যদেরও প্রসন্ন রাখতেন।

বাঙ্গালি চৌত্রিশ বছর আলিমুদ্দিনে বন্দি ছিল এখন তৃণমূলের দুর্নীতির পাঁকে হাঁসফাঁস করছে

বলাইচন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতবাসীর স্মৃতিশক্তি অতি দুর্বল। দু' একটা সংগঠন এবং দু' একজন ব্যক্তির উল্লেখে এই সত্যটার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। India Against Corruption নামক সংগঠনটির নাম মনে করতে পারবেন এমন ব্যক্তি দুর্লভ, অবশ্য হাতে গোনা দু'চারজন নিশ্চয়ই আন্না হাজারের নামটা স্মরণে আনতে পারবেন। অথচ চলতি দশকেই এই সংগঠনের আন্দোলন এবং এটির নায়ক সম্ভবত স্বাধীন ভারতবর্ষকে একটি নতুন স্বাধীনতা আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিলেন—দুর্নীতি থেকে স্বাধীনতা। বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশনায়করা প্রধানত দুটি বিষয়কে দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন---ধর্মীয় বিভাজন এবং উগ্রপন্থী সন্ত্রাস। কিন্তু একজন অশীতিপর অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী আন্না হাজারে তাঁর মরণপণ প্রচেষ্টায় আমাদের সম্মাননীয় দেশনায়কদের ভুল প্রমাণিত করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—সবচেয়ে বড়ো সমস্যাটার নাম হলো দুর্নীতি এবং সেটা ওপরমহলের দুর্নীতি আর নীচের মহলের দুর্নীতি নিয়ে নানান আইনকানুন থাকলেও ওপরতলায় ময়দান ফাঁকা। এই আন্দোলনের ফসল হিসেবে ভারতবাসী একটি আইনের দর্শন পেয়েছিল—লোকপাল। কিন্তু সেই আইনের রূপ দেখে অনেকে এটিকে Jokepal বলে কটাক্ষ করেছিলেন। তাছাড়া তার যথাযথ রূপায়ণ আমরা আজও দেখতে পাইনি। সেই আন্দোলনের কর্মী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রশান্তভূষণ, যোগেন্দ্র যাদবরা এখনও অনেক কার্যকর ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত আছেন বটে, কিন্তু কেন্দ্রব্যক্তি আন্না হাজারে বার্ধক্য এবং সম্ভবত হতাশার কারণে এখন আর ময়দানে নেই।

তবে পিঠোপিঠি দু'বার দেশ শাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সহযোগীরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন দু'দফার শাসনের অবসানের পিছনে আন্না হাজারের এই আন্দোলনের ভূমিকা অসামান্য। বিগত লোকসভার নির্বাচনে বিরোধীদের প্রচারধারা এবং নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তির কথা বিবেচনা করলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হতে পারে। এই বিরোধী প্রচারের প্রধান লব্জ ছিল 'চৌকিদার চোর হ্যায়' এবং সেই সঙ্গে নীরব মোদী, ললিত মোদী প্রভৃতি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পদবির সঙ্গে নরেন্দ্র দামোদর দাসের পদবির অশোভন মিল খুঁজে উপহাস। ফলাফল এই প্রচারটিকেই কেবল উপহাস করেছে তাই নয়, প্রধান প্রচারক মহাশয়ও এখন তাঁর দলের কাছেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন—তাই তিনি এখন অন্তরালেই প্রস্থান করেছেন। এমন অবস্থার প্রধান কারণ কিন্তু নরেন্দ্র মোদীজির দুর্নীতিহীন ভাবমূর্তি। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি মূল্যবান তথ্য বর্তমান শাসকগোষ্ঠী স্মরণে রাখলে উপকৃত হবেন। মনমোহন সরকার ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার সম্পর্কে যে আইনটি পাশ করিয়েছিল স্বাধীন ভারতবর্ষে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর আইন খুব কমই জনসমক্ষে এসেছে এবং এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ দুর্নীতিরোধে প্রভূত সহায়তা করবে।

> "বর্তমান শাসকরা তো সিনেমার ভিলেনের ঢঙেই দূরদর্শনের পর্দায় নোটের বান্ডিল হাতিয়েছেন। কুসঙ্গে যেমন সর্বনাশ হয় তাতো মেধাবী ছাত্র—বিখ্যাত অধ্যাপক—দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান সৌগত রায়ের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করে গুণীভক্ত বাঙ্গালি বেদনা অনুভব করেছে। আর অগ্নিকন্যা তো বাঙ্গালিকে আরও লজ্জা দিয়ে মদন মিত্রের মতো খুচরো নেতার জেলযাত্রার পর নিজেই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে 'আমরা সবাই চোর' প্ল্যাকার্ড হাঁকিয়ে কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়েছেন।"

প্রথম দুটি অনুচ্ছদ পড়ে মনে হতে পারে যে, দেশের দুর্নীতি প্রসঙ্গই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য, তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নিবেদন করি—মূল বিষয়বস্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্য শাসনব্যবস্থার দুর্নীতি সংক্রান্ত কার্যাবলী। আন্না হাজারে এবং এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর রসায়ন দিয়ে শুরু করলে বুঝতে সুবিধে হবে। স্মৃতিশক্তি একটু ঝালিয়ে নিলে মনে পড়বে---আন্না হাজারের সেই উত্তাল আন্দোলনের লগ্নেই দিল্লিতে একবার একই মঞ্চে আন্নাজী এবং মমতা ব্যানার্জির উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও মঞ্চের একদিকের সিঁড়িতে আন্নাজীর উত্তরণ লক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়া মঞ্চের উল্টোদিকের সিঁড়ি দিয়ে অবতরণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আবার তার কিছুদিন পরেই কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকরা আন্না হাজারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে কেবল একটু উপেক্ষাসূচক কাঁধ ঝাঁকুনি এবং বাঁকা হাসি উপহার দিয়ে তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরে অবশ্য দুর্নীতি বিরোধের প্রতিমূর্তি আন্না হাজারের সঙ্গে একটা চলনসই বোঝাপড়া গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লিতে তিনি তাঁর সঙ্গে একটা যৌথ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আন্নাজী তাঁর সুযোগ্য সহযোগীদের পরামর্শে এই সভায় হাজির থাকতে শেষ মুহূর্তে বিরত হন—দূরদর্শনের পর্দায় আমরা সেই শূন্যমঞ্চ এবং সভার জন্যে পেতে রাখা শতশত খালি চেয়ারগুলোর করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

লোকপাল আইন নিয়ে হইচই চলার কালে মমতা ব্যানার্জি লোকায়ুক্ত গঠনের ক্ষমতা রাজ্যের হাতে রাখার জন্য চেঁচামেচি

ফঃ ৬

করেছিলেন। লোকায়ুক্তের কাজ হলো মন্ত্রীনেতাদের দুর্নীতি-দমন। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতির মা মনসাকে বাঁ হাতে ফুল দেওয়ার ঢঙে একটি দুর্বল লোকদেখানো লোকায়ুক্ত আইন পাশ করিয়েছিল এবং হাইকোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে লোকায়ুক্ত নিয়োগও করেছিল। কিন্তু তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার পর সেই যে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে, আর খোলার নামগন্ধ নেই। আর মা মাটি মানুষের নেতা মন্ত্রীরা এমনিতেই যেভাবে সারদা--নারদা-রোজভ্যালি--কাটমানির অভিযোগের জালে আদালত-কারাগার-সিজিও কমপ্লেক্স-নিজাম প্যালেস প্রভৃত রমণীয় স্থানে ঘোরাফেরা করছেন, তাতে এরাজ্যের লোকায়ুক্তর প্রকৃতি দর্শন মিলবে এমন সম্ভাবনা আদৌ নেই। অথচ অন্যান্য দু'একটি রাজ্যে লোকায়ুক্তের কার্যকর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি—যেমন একদা কর্ণাটক রাজ্যের লোকায়ুক্ত বিচারপতি বেঙ্কটচালা কিম্বা তাঁর উত্তরসূরি বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ের কার্যাবলী নিয়ে সারা দেশেই আলোড়ন হয়েছে। চায়ের আসরে আমরা হালকা চালে প্রায়শই বলে থাকি—রাজনীতি ও শাসনক্ষমতা থাকলে হাজার দুর্নীতি করলেও সাতখুন মাফ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমনটা সত্যি হলেও হরিয়ানার চৌতালারা কিংবা বিহারের লালুপ্রসাদ তো সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি বটেই। এরাজ্যের বামপন্থী নায়করা শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রশাসন সহ সমগ্র বঙ্গসমাজকেই আলিমুদ্দিন থেকে শুরু করে এলসি পর্যন্ত বিভিন্ন দফতরে বন্দি রাখলেও চুরিচামারির কাজে তেমন কিছু দক্ষতা দেখাননি। আর বর্তমান শাসকরা তো সিনেমার ভিলেনের ঢঙেই দূরদর্শনের পর্দায় নোটের বান্ডিল হাতিয়েছেন। কুসঙ্গে যেমন সর্বনাশ হয় তাতো মেধাবী ছাত্র—বিখ্যাত অধ্যাপক—দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান সৌগত রায়ের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করে গুণী ভক্ত বাঙ্গালি বেদনা অনুভব করেছে। আর অগ্নিকন্যা তো বাঙ্গালিকে আরও লজ্জা দিয়ে মদন মিত্রের মতো খুচরো নেতার জেলযাত্রার পর নিজেই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে 'আমরা সবাই চোর' প্ল্যাকার্ড হাঁকিয়ে কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়েছেন।

দুর্নীতির ওপরতলায় অনেকক্ষণের সফর শেষে বর্তমান রাজ্য সরকারের নীচমহলের খবর এবং প্রসঙ্গক্রমে সে বিষয়ে শাসকদলের মনোভাব নিয়ে কিছু তথ্য দিয়ে এই দুর্নীতি-অভিশপ্ত প্রবন্ধ শেষ করব। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটা বাজারে এসেছিল, তাঁর উত্তরসূরীর আমলে তাঁরাই এখন স্তাবক। আমরা বাঙ্গালিরা (সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় 'আমড়া বাঙ্গালি') নিজেদের গাঁটের কড়ির বিনিময়ে সংবাদপত্র, টিভি, ল্যাম্পপোস্ট, আনাচে কানাচে দেখছি দিদির হাসিমুখ। অনাবশ্যক এই প্রচারের বিরুদ্ধে ফাইলে যাঁদের আপত্তির নোটিং দেওয়ার কথা তাঁরা তো এখন ভয়ে তটস্থ। আর নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে পুকুরচুরিতে যাঁরা ব্যস্ত তাঁদেরও এখন চোদ্দখুন মাফ হওয়ার রাস্তা 'মাননীয়া' নিজেই নির্মাণ করে দিয়েছেন। সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি দমন সম্পর্কে বর্তমান সরকারের জারি করা নির্দেশাবলীই সেই প্রশস্ত রাজপথ। সেগুলির চেহারা কেমন দেখা যেতে পারে।

শান্তনম কমিটির একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেই সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতির মোকাবিলা করার জন্য কিছু ব্যবস্থা করা হয় সর্বপ্রথম। সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন এবং সিবিআই গঠিত হয় ওই রিপোর্টের ভিত্তিতেই। ভাবতে অবাক লাগে, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সভাসদরা সগর্বে 'আমরা সবাই চোর' বিজ্ঞাপন নিয়ে রাজপথ কাঁপান, সেই পোড়া পশ্চিমবঙ্গই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন নির্দেশে রাজ্য ভিজিল্যান্স কমিশন গঠনের পথিকৃৎ রাজ্য ছিল। সংশ্লিষ্ট Resolutionটি জারি হয় ৪ মার্চ, ১৯৬৫ তারিখে। 'বাঙ্গালির নয়নের মণি' পরিচালিত বর্তমান রাজ্য সরকার সেই Resolution টি বাতিল (Replace) করেছে ১০ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে একটি Resolution-এর বলে। দুটো Resolution পাশাপাশি রেখে খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে আদ্যিকালের নির্দেশটির উদ্দেশ্য ছিল সৎ এবং এবারেরটা আমাদের ঠিক উল্টোপথের দিশা দেখাচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য কোনওদিনই প্রকৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কারণ বিভিন্ন সময়ে ভিজিল্যান্স কমিশন আর্জি জানালেও সরকার কোনও আইন করেনি—আগের এবং পরের দুটিই Resolution মাত্র।

নতুন Resolution-এ বারবার ১৯৮৮ সালের P.C (Prevention of corruption) Act. ১৯৮৮-র কথা বলা হয়েছে এবং বড়ো গলায় বলা হয়েছে ভিজিল্যান্স কমিশন এই আইনের রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু আইনের ঢাল-তরোয়াল ছাড়া সেটা কীভাবে সম্ভব সেটা দিদিকে বললে তবেই বোধহয় জানা যাবে। আসল কথা হচ্ছে ভিজিল্যান্স কমিশনের মূল কাজ তো আর P. C. Act রূপায়িত করা নয়—Service Rules লঙ্ঘনের অপরাধে বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে শাস্তি বিধানের সুপারিশ করা। এসব কথা কিন্তু নতুন Resolution-এ নেই, বরং আছে অপ্রাসঙ্গিক P.C. Act সম্পর্কিত বাগাড়ম্বর। তাছাড়া Vigilance Commission-এর অন্তর্গত Anti-corrouption Bureau-র পুলিশ অফিসাররা তো চিরদিনই প্রয়োজনমতো চোরছ্যাঁচড়দের বিরুদ্ধে P.C. Act প্রয়োগের জন্য থানায় অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন। এই কাজটা হয় Cr. P.C অনুযায়ী। নতুন Resolution-এ বৃথাই P.C. Act-এর বুকনি দেওয়া হয়েছে। আগে সবেধন নীলমণি একজন V.C ছিলেন এখন হয়েছেন দু'জন এবং মাথার ওপর আবার State Vigilance Commission বসেছেন। যাঁর বেতন হাইকোর্টের বিচারপতির সমতুল্য। এসব তো হলো—কিন্তু জগন্নাথ হয়ে গেলেন ঠুঁটো। কারণ তদন্তের সিদ্ধান্ত আগে V.C ই নিতেন, এখন নিদান হয়েছে বড় সায়েবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে তদন্তের জন্য রাজ্যসরকারের অনুমতি লাগবে। আগে V.C-র সুপারিশ খারিজ করার অধিকার ছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর হাতে—এখন সংশ্লিষ্ট দফতরই তা পারবে।

২০১২ সালেরই ২ আগস্ট তারিখে সরকার আরেকটি চমকপ্রদ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে (No. 655)। এখানে P & AR Department-এর অন্দরেই একটি দুর্নীতি নিরোধক শাখা খোলার কথা বলা হয়েছে। একজন আইজিপি-র অধীনে ওজনদার আরও অফিসারদের নিয়ে এটি কাজ করছে। এটির কাজ কিন্তু 'তদন্ত' নয়—'খোঁজখবর' মাত্র। এই শাখা খোঁজখবর করে মুখ্যসচিবের কাছে মাসিক প্রতিবেদন পেশ করবে। তিনি পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে—"যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য" (শাস্তিবিধানের নামগন্ধও নেই)। এমন ফরমান তো রাজরাজড়া বা বাদশাহরা জারি করতেন বলেই গল্পে এবং ইতিহাসে পড়েছি। দুটো সরকারি নির্দেশেই কেমন যেন টকটক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? ▮

আইআইটি খড়্গাপুরে তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবকদের আয়োজিত কর্মসূচিতে পরিবেশগত বিষয়ের গুরুত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আইআইটি খড়্গাপুরে তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবকদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শক্তি ও পরিবেশ সংক্রান্ত মূল বিষয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী তাদের মতামত ও তাদের তৈরি মডেল পেশ করে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণের প্রসার নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরে।

তৃতীয় পর্বের এই কর্মসূচিতে দেশ-বিদেশের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এই বিষয়গুলির মধ্যে ছিল--- স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হার্ডওয়্যার মডেলিং, প্রোডাক্ট ডিজাইনিং, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ তথা শক্তি ও পরিবেশ। আইআইটি খড়্গাপুর ক্যাম্পাসে গত ৮ থেকে ১০ নভেম্বর এই কর্মসূচির চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতাগুলির আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সেরা পুরস্কার পেয়েছে ভুবনেশ্বরের কেআইআইটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দিব্যাঙ্গ দল। এই দলের পড়ুয়া প্রীতেশ দেব, দিব্যান সাহু এবং অঙ্কিত প্রধান এবারের প্রতিযোগিতায় বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের উপযোগী এমন একটি 'গ্রিন ওয়াটার ডিসপেন্সর' তৈরি করে যা পা বা দৈহিক ভারকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করা সম্ভব। এই ওয়াটার ডিসপেন্সর ব্যবহারের জন্য একটি সরল লিভার মেকানিজম রয়েছে যা চাপ দিলেই ডিসপেন্সর থেকে জল নিষ্কাষণ হবে।

হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের ভারতীয় বিদ্যাভবন পাবলিক স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে গঠিত দলটি প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার-আপ হয়েছে। এই দলের পড়ুয়ারা নারকেল খোলা এবং ভুট্টার খোসা দিয়ে এমন একটি চারকোল স্মোক ফিল্টার তৈরি করেছে যা যন্ত্রচালিত গাড়িতে ব্যবহার করলে দূষণ কমানো সম্ভব। সৃজনশীল এই উদ্ভাবনের জন্য পড়ুয়াদের এই স্বীকৃতি। সেকেন্ড রানার-আপ হয়েছে হায়দরাবাদেরই ব্রহ্ম প্রকাশ ডিএডি স্কুল। এই বিদ্যালয়ের তিন পড়ুয়া পি প্রণবাদিত্য, রাজ ভট্টাচার্য এবং শ্রেয়স বিরাদারকে নিয়ে গঠিত দলটি চন্দ্রযান অভিযান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সাতটি সমতল আয়নার সহযোগে অ্যাসট্রন নামে এমন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেছে যা দিয়ে মহাকাশ অভিযানের সময় উৎকৃষ্টমানের ছবি তোলা সম্ভব। এই প্রতিযোগিতায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনগুলির মধ্যে রয়েছে 'সখী'— পরিবেশ-বান্ধব স্যানিটারি প্যাড। কলকাতার দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তুলো, শুকনো পাতা, রেসিন ও নারকেল ছোবড়ার টুকরো অংশ দিয়ে অভিনব এই স্যানিটারি প্যাড তৈরি করেছে। এই আবিষ্কারের জন্য কলকাতায় ওই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অ্যাডিপেক-এ ভারতীয় প্যাভেলিয়নের উদ্বোধন ধর্মেন্দ্র প্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ইস্পাত মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ আবু ধাবি আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম প্রদর্শন ও সম্মেলন (অ্যাডিপেক)-এ ভারত প্যাভেলিয়নের উদ্বোধন করেন। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি (এফআইপিআই), ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হাইড্রোকার্বন্স (ডিজিএইচ) ও কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-সহ নয়টি ভারতীয় তেল ও গ্যাস সংস্থা এই প্যাভেলিয়নের আয়োজন করেছে।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে প্রধান বলেন, ভারতের জ্বালানির চাহিদা প্রচুর। আগামী দিনগুলিতে আন্তর্জাতিক স্তরে জ্বালানির চাহিদা মেটাতে ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ালেও আগামী দুই দশকে তেল ও গ্যাস-নির্ভর জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বজায় থাকবে। তিনি বলেন, তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে তেল শোধন, পাইপলাইন বসানো ও গ্যাস টার্মিনালের ক্ষেত্রে ভারত ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে। শ্রী প্রধান বিনিয়োগকারীদের শক্তিক্ষেত্রে আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানান। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা এবং বিপুল বাজারের কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারত আকর্ষণীয় গন্তব্য। মন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি জ্বালানির খুচরো ব্যবসায় বিপুল সংস্কার করা হয়েছে।

অ্যাডিপেক-এর আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী অধিবেশনে শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ভারতকে গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতি ও পরিবেশ-বান্ধব, স্বচ্ছ জ্বালানির ব্যবহারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতা, সৌর ও বায়ুশক্তি-সহ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চিরাচরিত জ্বালানি ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা এবং সিওপি-২১ প্যারিস জলবায়ু অঙ্গীকারপত্র মেনে চলার অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে এশিয়া মহাদেশ অগ্রণী স্থানে পৌঁছেছে।

গুরু নানক দেবজীর আদর্শ ও মূল্যবোধের উপদেশ আরও বেশি করে তুলে ধরার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুরু নানক দেবজীর আদর্শ ও মূল্যবোধের উপদেশগুলি আরও বেশি করে তুলে ধরার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সুসংহত চেকপোস্ট এবং করতারপুর করিডরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ডেরা বাবা নানক আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। গুরু নানক দেবজীর ৫৫০ তম আবির্ভাব-তিথি উদযাপন উপলক্ষ্যে তিনি একটি স্মারক মুদ্রারও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

এক বিশাল জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পবিত্র ডেরা বাবা নানকে এসে করতারপুর কবিডর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করে তিনি নিজে গর্বিত বোধ করছেন। এর আগে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি প্রধানমন্ত্রীকে কোয়ামি সেবা পুরস্কার প্রদান করে সংবর্ধনা জানায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি এই পুরস্কার গুরু নানক দেবজীর পদকমলে নিবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৫৫০তম গুরু নানক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে সুসংবদ্ধ চেকপোস্ট ও করতারপুর করিডরের উদ্বোধন তাঁর কাছে পরম আশীর্বাদ। চেকপোস্ট ও করতারপুর করিডরের সূচনার ফলে পুণ্যার্থীদের পাকিস্তানে গুরুদ্বার দরবার সাহিবে যাতায়াতে সুবিধা হবে।

শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি, পঞ্জাব সরকার-সহ রেকর্ড সময়ে যারা এই করিডর নির্মাণের কাজ শেষ করতে অবদান রেখেছে, তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে সীমান্ত পেরিয়ে পুণ্যার্থীদের যাতায়াত আরও সুগম হবে। এই করিডর নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হওয়ায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও অন্যান্যদের প্রতি মোদী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গুরু নানক দেবজীকে কেবল ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণা-দায়ক বলে বর্ণনা করে মোদী বলেন, গুরু নানক দেবজী একজন আদর্শ ধর্মগুরুই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এক

স্তম্ভস্বরূপ। গুরু নানকজী প্রকৃত মূল্যবোধ অনুসরণ করে বেঁচে থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের দিশা দেখিয়েছিলেন। একই সঙ্গে সততা ও আত্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি এক সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গুরু নানক দেবজী সমাজে সমতা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং একতার প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছিলেন। সামাজিক কুসংস্কারগুলি দূরীকরণেও তিনি আমাদের লড়াইয়ের পথ দেখিয়েছিলেন। করতারপুরকে গুরু নানক দেবজীর স্বর্গীয় অনুভূতিতে ভরা এক পবিত্র স্থান হিসাবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই করিডর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও অনুগামীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত পাঁচ বছর ধরে তাঁর সরকার দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বার্থে কাজ করে চলেছে। গুরু নানক দেবজীর ৫৫০তম আবির্ভাব- তিথি উপলক্ষে দেশে এবং বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। গুরু গোবিন্দ সিংহজীর ৩৫০তম জন্মবার্ষিকী সারা দেশ জুড়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহজীর স্মৃতিতে গুজরাটের জামনগরে ৭৫০টি শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউনেস্কোর সহায়তায় তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে বিশ্বের একাধিক ভাষায় 'গুরু বাণী'র অনুবাদ করা হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, সুলতানপুর লোধি শহরকে ঐতিহ্যবাহী শহর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে এবং গুরু নানকজীর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিকে যুক্ত করে একটি বিশেষ ট্রেন পরিষেবার সূচনা হয়েছে। গুরু নানকজীর স্মৃতি বিজড়িত একাধিক স্থান, যেমন— শ্রী অকাল তখত, ডাম ডামা সাহিব, তেজপুর সাহিব, কেশগড় সাহিব, পাটনা সাহিব এবং হুজুর সাহিবের সঙ্গে ট্রেন ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ানো হচ্ছে। অমৃতসর ও নামদেবের মধ্যে বিশেষ বিমান পরিষেবার সূচনা হয়েছে বলেও তিনি জানান। অমৃতসর থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে 'এক ওঙ্কার' বাণী প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী শিখ পরিবারগুলি উপকৃত হয়েছেন। বিদেশে বসবাসকারী শিখ পরিবারগুলি ভারতে আসার সময় বিগত বছরগুলিতে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা আজ দূর করা হয়েছে। এখন প্রবাসী শিখ পরিবারগুলি ভিসা ও অনাবাসী ভারতীয় কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন। এর ফলে, অনাবাসী শিখ পরিবারগুলি সহজেই ভারতে এসে তাঁদের আত্মীয়- স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে এবং পবিত্র স্থানগুলিতে ভ্রমণ করতে পারবেন। তিনি আও বলেন, সরকারের আরও দুটি সিদ্ধান্তের ফলে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এর একটি হলো--- সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তে জম্মু ও কাশ্মীর তথা লাদাখে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা দেশের বাকি অংশের সাধারণ মানুষের মতো সমানাধিকার পাবেন। দ্বিতীয়টি হলো— নাগরিকত্ব সংশোধন বিলের ফলে শিখরা এখন থেকে ভারতের নাগরিক হওয়ার সুযোগ পাবেন। ■

এই রায়ে কেউ জেতেনি কেউ হারেওনি : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অযোধ্যা মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাগত জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের প্রতি দেশের মানুষের আবেগ ও শ্রদ্ধা সম্মানিত হয়েছে এই রায়ে। সাত দশক ধরে ঝুলে থাকা এই মামলার প্রতিটি স্তর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছে আদালত। রায় ঘোষণার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমরা স্বাগত জানাই। কয়েক দশক অপেক্ষা করার পর অবশেষে একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে। এই রায়ে কেউ জেতেনি, কেউ হারেওনি। আদালতের রায়ের পর যেভাবে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়েছে তার জন্য আমরা দেশের প্রতিটি মানুষকে অভিনন্দন জানাই।' তিনি আরও বলেন, 'ধর্মমত নির্বিশেষে আমরা সবাই দেশের নাগরিক। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। অতীতের মনোমালিন্য ভুলে দেশের প্রতি দায়িত্বপালনই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আদালতের রায়ে উচ্ছ্বসিত বলিউড

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার পর বলিউডে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। কঙ্গনা রানাওয়াত, অনুপম খের, মধুর ভাণ্ডারকর ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কঙ্গনা রানাওয়াত বলেন, 'ভারতে আমরা সকলেই যে সুখেশান্তিতে বসবাস করছি এই রায়ে তার নির্যাস উঠে এসেছে। এই রায় আমাদের দেশের মহান আদর্শ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথাটিও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। সকলকে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে চলার অনুরোধ করে পরিচালক হংসলাল মেহতা বলেন, 'বহুদিনের এক বিতর্কের মীমাংসা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আমাদের সকলের এই রায় খোলামনে গ্রহণ করা উচিত। সেই সঙ্গে এও বলব, যারা এই রায় থেকে রাজনৈতিক ফয়দা ওঠাতে চান কিংবা চ্যানেলের টিআরপি বাড়াতে চান, তাদের উপেক্ষা করা প্রয়োজন।'

উত্তরাখণ্ডে সীতামন্দির নির্মাণ করবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তরাখণ্ড সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাউরিতে একটি সীতামন্দির নির্মাণ করা হবে। সম্প্রতি এক জনসভায় ভাষণ দেবার সময় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়াত বলেন, পাউরির উন্নয়নে সীতামন্দির

একটি মাইল ফলক হয়ে উঠবে। ভগবান রাম এবং মাতা সীতার ভক্ত বহু মানুষ সারা বিশ্ব থেকে এখানে আসবেন। নানা কারণে ইতিহাসে পাউরির একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। জনশ্রুতি, এখানকারই ফলসওয়াড়ি গ্রামে সীতা পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। মন্দির নির্মাণের জন্য গ্রামের প্রত্যেক পরিবার একটা ইট, এক মুঠো মাটি আর এগারো টাকা চাঁদা দেবে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

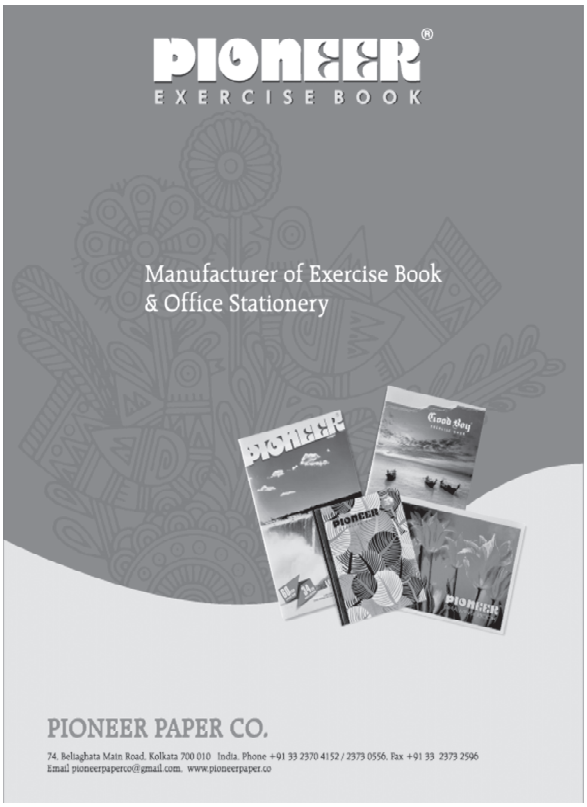

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

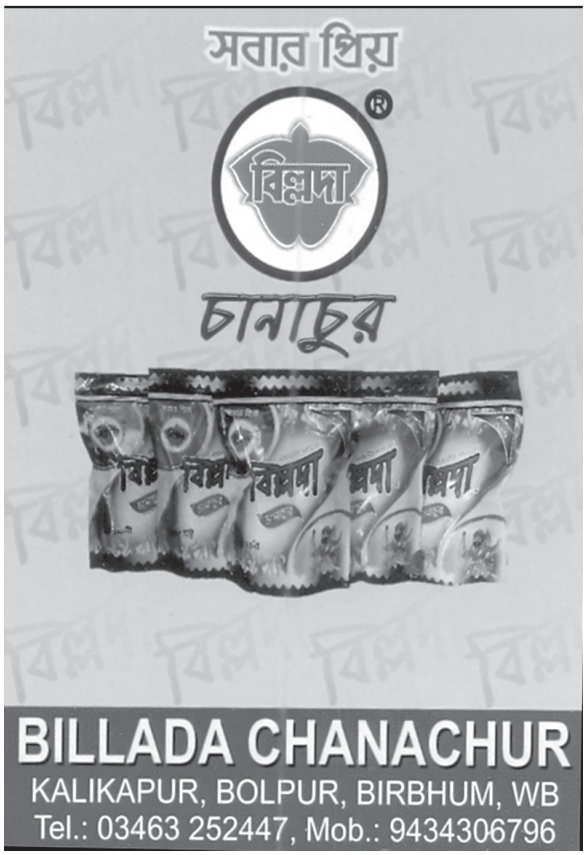

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সরোজ কুমার দত্ত গত ২৯ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি কলকাতা সল্টলেক শাখার স্বয়ংসেবক নিশীথ কুমার দত্তের পিতৃদেব এবং প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্তের পিতৃব্য ছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি বেশ কয়েকদিন নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি স্বয়ংসেবক হন। মুখ্য শিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি সঙ্ঘের বিভিন্ন পুস্তিকা নিয়ে ব্যক্তি সম্পর্ক করতেন। সেদিন তাঁর মরদেহ কেশব ভবনে আনা হলে কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ জিষ্ণু বসু তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানিয়ে আসেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতার পাটুলি শাখার কিশোর স্বয়ংসেবক অভিজিৎ মণ্ডল গত ৭ নভেম্বর দুর্গা নবমীর দিন এক পথ দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৬ বছর। উল্লেখ্য, অভিজিৎ ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় কার্যকর্তা নিতাই মণ্ডলের কনিষ্ঠ পুত্র । সে প্রাথমিক শিক্ষণ প্রাপ্ত এবং আনক বাদক ছিল।

* * *

মালদহ জেলার কালিয়াচকের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বিশিষ্ট অর্শ চিকিৎসক ডাঃ ভূদেব চন্দ্র সাহা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৭ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৩ কন্যা-জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তৎকালীন মালদা জেলা প্রচারক সুধাময় দত্তের হাত ধরে তিনি স্বয়ংসেবক হন। ১৯৮৩ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একাত্মতা রথযাত্রায় কালিয়াচকে লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল তাঁরই সফল নেতৃত্বে। শ্রীরামমন্দির আন্দোলনে কালিয়াচকের সমস্ত গ্রামে তাঁর প্রেরণায় রামশিলা পূজন হয়েছিল। তিনি কালিয়াচক শাখার কার্যবাহ, মণ্ডল কার্যবাহ, খণ্ড কার্যবাহ, মহকুমা কার্যবাহ ইত্যাদি নানা দায়িত্ব যোগতার সঙ্গে পালন করেছেন।

তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে ১৯৮৫ থেকে '৯০ এই পাঁচবছরে কালিয়াচক খণ্ডে ৫২টির বেশি শাখা শুরু হয়েছিল। শাখাগুলি স্থায়িত্ব লাভও করেছিল। তিনি সমাজসেবী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অর্শ নিরাময় শিবির করে তিনি কয়েক লক্ষ রোগীকে নিরাময় করেছেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর অন্তিম যাত্রায় শত শত স্বয়ংসেবক ও নাগরিক অংশগ্রহণ করেন।

* * *

দক্ষিণ কলকাতার নেতাজী নগরের শান্তিনগর শাখার স্বয়ংসেবক সুশান্ত কুমার গাঙ্গুলি (কুট্টি) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরম জনিত কারণে গত ১৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি জিওলজিক্যাল ইন্ডিয়াতে চাকুরি করতেন। ৫ ভাই, ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছোটো ছিলেন। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

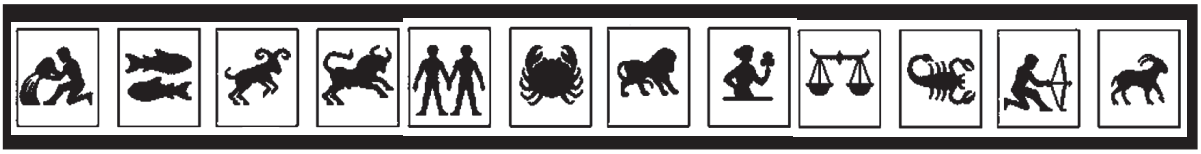

১৮ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ২৪ নভেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, তুলায় মঙ্গল, বক্রী বুধ, বৃশ্চিকে রবি, শুক্র, ধনুতে বৃহস্পতি, শনি, কেতু। ২১-১১ বৃহস্পতিবার বুধ মার্গীরূপ পরিগ্রহ করছে এবং ওইদিন রাত্রি ৯টা ৫২ মিনিটে শুক্রের ধনুতে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে অশ্বিনী নক্ষত্র থেকে মিথুনে পুনর্বসু নক্ষত্রে।

মেষ : চলাফেরায় সতর্ক ও কথাবার্তায় সংযত থাকা দরকার। কলাকুশলীদের নতুন সংবাদে উৎসাহ, অনুষ্ঠানে ব্যস্ততা, বিদ্যার্থীদের চিন্তায় স্বচ্ছতা, উদ্ভাবনী শক্তি, গবেষণা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রবাস ও অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ। সপ্তাহের শেষভাগে ব্যস্ততায় ক্লান্তি বোধ। দাঁত, কান ও পায়ের চিকিৎসার ব্যয়।

বৃষ : কায়িক পরিশ্রমই পারিবারিক স্বচ্ছলতার একমাত্র পাথেয়। অধস্তনের অসহোযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে চাপ ও উদ্বেগ। পিতৃদত্ত সম্পত্তি ও স্ত্রীর জেদের কারণে স্বজন সম্পর্কে অবনতি। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবাসীর প্রত্যাবর্তন। স্নেহপ্রবণতা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুণীজন সান্নিধ্যে স্বচ্ছন্দ পদচারণা ও সৃষ্টির আনন্দ।

মিথুন : শরীর, মন, বুদ্ধি নানাবিধ জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকবে। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, তত্ত্ব ও তথ্যসন্ধানী দৃষ্টি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে সুন্দর ও কর্মময় জীবন। গৃহ ও মাতৃসুখ, যুবক বন্ধু হিতকারী। শৌখিন ব্যবসায় সমৃদ্ধি। গৃহলক্ষ্মীর বিচক্ষণতায় প্রতিকূলতার অবসান ও দীর্ঘদিনের বাসনার পূর্তি।

কর্কট : জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধারস পানে বিদ্যার্থীর সুষম প্রকাশ ও বাস্তবায়ন। কর্মক্ষেত্রে সংস্থাগত পরিবর্তন ও ভ্রাতা-ভগ্নীর সার্বিক উন্নতির যোগ। হৃদয়ের ভক্তির হিল্লোলে চিত্তভূমিকে উদ্বেলিত করার সম্ভাবনা। তথাপি সৌজন্যের রীতি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাও সরলতায় অবিচল থাকবে।

সিংহ : শারীরিক রক্তচাপ, অতিরিক্ত ভাববেগ, পুরাতন প্রেমজ সম্পর্ক ও প্রতিবেশীর প্ররোচনায় সতর্কতার সঙ্গে সংযত ও সংবেদনশীল হওয়া দরকার। কর্তৃপক্ষের শংসা, আর্থিক সাবলীলভাব বজায় থাকলেও অপ্রত্যাশিত ব্যয় ও জমার ভাণ্ডারে হাত পড়ার সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীর প্রতিষ্ঠা ও সন্তানের মেধার বিকাশ।

কন্যা : শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত, আয়ের মন্থর গতি, ছলনাময়ীর মায়াজাল ও যুবকরা ছিদ্রান্বেষী বিষয়ে সতর্ক না হলে সময়ের অপচয় ও সম্মানহানি যোগ। পরিস্থিতি অনুযায়ী জীবনসঙ্গীর সঠিক সিদ্ধান্ত পারিবারিক সুস্থিতির সহায়ক। স্ত্রীর নামে ব্যবসায় উদ্যোগে সাফল্য।

তুলা : দৃঢ় প্রত্যয়, অধ্যবসায় ও মনঃসংযোগ ব্যতিত বিদ্যা- জ্ঞানার্জনে সাফল্য অনিশ্চিত। আয়ের শ্লথ গতি ও ব্যয়বাহুল্যের কারণে সঞ্চয়ে হাত। নতুন বিনিয়োগ স্থগিত, নিকট ভ্রমণ, আইনি জটিলতা আসতে পারে।

বৃশ্চিক : বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বনির্ভর কর্মে উন্নতির সঙ্গে বিকল্প উপার্জনের সন্ধান। প্রতিবেশী ও ভ্রাতৃস্থানীয়ের সঙ্গে সম্পত্তি বিষয়ক মনোমালিন্য। আইনি জটিলতায় উদ্বেগ, অর্থনাশ। স্ত্রীর ব্যবসার প্রসার। কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি থাকলেও মানসিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। প্রেম-প্রণয় ও পত্নী রূপের সার্থক প্রকাশ।

ধনু : চপলতা, জেদ, অমিতব্যয়ীতায় রাজদণ্ড, প্রশাসনিক ঝামেলা, স্থানান্তর ও মিত্র শত্রুতে পরিণত। বকেয়া কাজ ও অর্থপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্তদের সৃজনশীলতার ও পাণ্ডিত্যের নব উন্মেষ। বিত্ত, প্রশংসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। গতানুগতিকতা ছেড়ে নব আঙ্গিকে আগামীর পথচলা।

মকর : নিকটজনের বিবাহের দিনক্ষণ নির্ধারণ। হঠাৎ প্রাপ্তি অথবা হারানো সামগ্রির সন্ধান। মায়ের নামে ব্যবসায় ভালো লাভ। দুরূহ কোনো কাজের সমাধানে কর্তৃপক্ষের শংসা। লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, লিখিত চুক্তি এবং মূত্রাশয়ের জটিলতায় সতর্ক থাকা শ্রেয়। সামাজিক কর্ম করে উদার হৃদয়ের প্রকাশ। জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্যে মানসিক প্রশান্তি।

কুম্ভ : পার্থিব ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্যের আকুলতা ও বিধি বহির্ভূত ভাবে উপার্জনের উন্মাদনায় নির্বিকার চিত্তে অসৎ সংসর্গে যোগদান। মামলা-মোকদ্দমায় কর্তব্যে ত্রুটি ভ্রাতৃত্ব ও স্ত্রী-বিরোধ, জীবিকার্জনে অনিশ্চয়তায় সমাচ্ছন্ন জীবন। তবে সপ্তাহের প্রান্তভাগে হতাশার গ্লানি ও অনুশোচনার দাবানল মোচনার্থে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপা লাভ।

মীন : পূর্ণিমার দ্যুতির ন্যায় জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের বিকাশ ও প্রতিভার উজ্জ্বল ভাস্বর। বক ধার্মিক বন্ধুর সংসর্গ এড়িয়ে চলা শ্রেয়। পিতার বৈষয়িক সমৃদ্ধি। শান্ত-সংযত ভাবে কর্মস্থানে দায়িত্ব পালন বুদ্ধিমত্তার পরিচয়বাহী। সশরীরে উপস্থিতি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান। শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত ও বাহন চালকদের সতর্কতা প্রয়োজন।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য